মনোতোষ সরকার

উত্তর বসন্ত

গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রণজিৎ সিকদার

দয়ানন্দ সেন

রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী

বন্ধুবরেষু

॥ প্রকাশক ॥

ভবানী প্রসাদ চক্রবর্তী

৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৯

॥ মুদ্রক ॥

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ঘোষ আর্ট প্রেস

মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৭

॥ প্রচ্ছদ শিল্পী ॥

নির্মল ঘোষ

নিউ গস্ আর্ট কটেজ

১০/২, পটুয়াটোলা লেন

কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ

শ্রাবণ ১৩৬৪

দাম দু' টাকা

আড়াই ডজন ঘরে আড়াইশো লোকের বাস।

এ ছাড়া উপায় কী? অন্তত ভেবে আর কোনো উপায়, কোনো প্রতিকারের পথ খুঁজে পায়নি কৃষ্ণগোপাল।

তবে একেবারে নিশ্চিন্ত নয়, একেবারে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট বসে নেই। খোঁজ খবর ঠিকই রাখছে—জানাশোনা লোক-জন, বন্ধুবান্ধব সকলের কাছেই জানিয়ে রেখেছে। চোখকান খুলেই আছে সতর্ক হয়ে।

আর সেইজন্যেই বুঝি চোখে পড়ে—বোবা, নির্বাক মাধুরী। অনুভূতিহীন। উপেক্ষায় মাঝে মাঝে উন্মাদ হয়ে ওঠে কৃষ্ণগোপাল। এর চেয়ে কঠিন, কঠোর, কটুকথা বলে না কেন মাধুরী? তীব্র অসন্তোষে ফুঁসে ওঠে না কেন? কেন রোজ রোজ কৃষ্ণগোপালের বাহুবন্ধনে ধরা দেয় বিনা প্রতিবাদে? কেন আবছা অন্ধকারে কৃষ্ণগোপালের বুকে মাথা রেখে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে না? মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে কৃষ্ণগোপাল, যেন একটা বিকৃত বহু-পুরাতন ম্যমিকে সে আলিঙ্গন করে আছে।

শুধু কখন আসবে লবঙ্গিনী, তাই কান পেতে থাকে কৃষ্ণগোপাল। লবঙ্গিনী কাঁপা হাতে লাঠি ঠুক্‌ঠুক্ করতে করতে আসবে। মাথা কাঁপতে থাকবে নড়বড়ে রোগা ঘাড়ের ওপর। ধপধবে শাদা কাশের মতো ফুরফুরে চুল। বুড়ি এসেই বলবে, হ্যাঁরে কিষ্টা, বাইত্তে যাবি না?

প্রথমে উত্তর দেয় না কৃষ্ণগোপাল। মাথায় হাত বুলোয় নিজের। শেষকালে লবঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বলে, কি কও?

বুড়ি বলে, বাড়ি যাবি কবে? আমারে নিয়া নে সাথে—মাথার দোলানির সঙ্গে কাঁপে বুড়ির গলার স্বর।

হঠাৎ বাড়ি যাওনের কি হইল ঠাক্‌মা? কইলকাত্তা আইলা, থাকো কয়টাদিন—

না-রে, বুড়ি বলে, আর থাকবার মন চায় না। এ ছ্যাশে মন টেকে না—পরান পোড়ে—

এরপরে হঠাৎ কিছু উত্তর দিতে পারে না কৃষ্ণগোপাল। চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। অনেকক্ষণ আগেই উঠে গেছে মাধুরী। বিছানায় তারই একটা মৃদু অথচ মাতাল সৌরভ। কয়েকটা কালো নরম চুল ছড়ানো। মনে পড়ল মাধুরীর শ্যামল মুখশ্রী। কালো ঘনআঁখিপল্লবে রহস্যময় সংকেত, রাঙা টুকটুকে ঠোঁট—সেই মুহূর্তে বাইরে মাধুরীর গলা পাওয়া গেল। জলের কলে বুঝি ফের গণ্ডগোল বেধেছে।

আপনাগো কিনা জল পাইছেন নাকি? সেই কুন ভোর থিকা অখনতরি জল নওনের, ছান করনের কামাই নাই? ভাবছেন কি আপনারা?

সঙ্গে সঙ্গে কানে আসে প্রতিপক্ষের জোরালো উত্তর, ইঃ, কি নবাবের বিটিরে আমার, ওনার লাইগা আর কেউ কাম করব না! অহ্লাদ দেইখ্যা আর বাঁচি না?

সক্কালবেলা ঝগড়াটিগো মুখে কিরা পড়ুক মুখে কিরা পড়ুক।

হঠাৎ মনে হল অবাবশ্যকভাবেই, অনেকদিন হল পান খায় না মাধুরী। আগের মতো পানের রসে লাল টুকটুকে ভেলভেটের মতন মনে হয় না, ঠোঁট এখন কেমন যেন শাদা ফ্যাকাশে—ম্যাড়মেড়ে—আচ্ছা, কেন পান খায় না মাধুরী? ঠোঁট দুটো তো ভারি মিষ্টি দেখাতো তার!

বুড়ি বসে ঢুলছিল। তারপর মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আমারে ছাশে পাঠাইয়া দে কিষ্টা। আমার এইখানে একদণ্ডও মন টিকে না—মন চায় না থাকতে, মন চায় না—আসনের সময় দেখছিলাম সিন্দুরের কলমে বোল আইছে, কত আমই না ধরছে কে জানে? চোখ বুজে ছবিটা বুড়ি ভালো করে চোখের সামনে তুলে ধরতে চায়। আহা কি দেশ, সোনার দেশ ছেড়ে এসেছে সেকথা ভুলবে কি করে লবঙ্গিনী?

অবাক হয়ে বসে থাকে কৃষ্ণগোপাল। কেমন নির্জীবের মতো মনে হয় নিজেকে। ভাড়াটে বাড়ির জানলায় হিসাবী সূর্যের কৃপণ দাক্ষিণ্য চিক্ চিক্ করে শেষ বেলার আলোর মতো।

বারান্দায় চায়ের সরঞ্জামের টুংটাং আওয়াজ আসে। চায়ের প্রস্তুতি চলেছে বুঝি! আর দেরি করার সময় নেই। নিমডালে দাঁত ঘসতে ঘসতে মুখ ধুতে যায়। কলতলায় মেয়েদের কথাকাব্য শেষ হয়ে পুরুষদের জল সংগ্রহের কঠিন সংগ্রাম শুরু হয়েছে।

চান করে এসে শুকনো রুটি চিবুতে চিবুতে চায়ে চুমুক দিল কৃষ্ণগোপাল, আস্তে আস্তে মৌজ করে। সুরুৎ সুরুৎ শব্দ ওঠে ঠোঁটে গ্লাসে চায়ের গরম লিকারের সহযোগে। রুটি চিবুতে চিবুতে মাঝে মাঝে গা ঘুলিয়ে ওঠে কৃষ্ণগোপালের। মনে পড়ে দেশে থাকতে এই সময়ে সকালে সাজিভর্তি মুড়ি গুড় নিয়ে বসত। হঠাৎ মনে হল এই সময় নয়, দেশে ভোর হতো আরো সকালে, শেষরাতের আবছা ছায়ায় ছায়ায়। পাখীদের কাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠত চারদিক। আর দূরদিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের খেতের ওপর দিয়ে বয়ে আসা পদ্মার ঝিরঝিরে হাওয়ায় শিরশির করে উঠত সারা শরীর—কার্তিক মাসের শেষরাতের আলতো শীতের স্পর্শের মতো। সেই রাত থাকতেই উঠে পড়ত কৃষ্ণগোপাল। কোঁচার খুঁট গায়ে

জড়িয়ে বাড়ির সামনের মাঠের ওপর প্রকাণ্ড বটগাছটার নিচে গিয়ে বসত। ভারি ভালো লাগত কৃষ্ণগোপালের। তার কত পরে সূর্য উঠত। আবছা রাত্রির মেঘে এসে পড়ত সূর্যের মৃদু গোলাপী আভা। ক্রমে আশেপাশে, দূরে লোকজনের চলাচল শুরু হত। আশপাশ দিয়ে যায় কেউ কেউ, এমন কি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়েও। দূরে খালে কাদের নৌকোর শাদা পালে যেন আগুন ধরে গেছে। চোখ বুজলেও স্পষ্ট দেখতে পায়—চোখ বুজে দেখতে দেখতে চায়ে চুমুক দিতে ভুলে যায় কৃষ্ণগোপাল।

একটু বাদেই রেডিমেড জামা শায়া, ব্লাউজের বোঝা নিয়ে বেরুবে কৃষ্ণগোপাল। জামাকাপড়ে ঠাসা ভারি বোঝাটা নিয়ে ঝুঁকে পড়বে সামনের দিকে। এই কৃশ,শীর্ণ লোকটাকে আরও শীর্ণ দেখাবে। চোয়ালের হাড় দুটোকে আরও যেন স্পষ্ট মনে হবে দুপুরের দুরন্ত রোদে। আর অদ্ভুত সুর করে হাঁকার সঙ্গে কপালের শিরাগুলো কেমন যেন মোটা দড়ির মতো পাকিয়ে ওঠেঃ চাই শায়া—ব্লা-আ-আ-উস্, করুণ কণ্ঠের আর্তনাদ যেন শহরের উপকণ্ঠের প্রত্যেক গলি, উপগলি, ছোট রাস্তার প্রত্যেক গৃহস্থের জানলার সামনে এসে আছড়ে পড়বে।

দুপুরের অবসরে জানলায় যখন কৌতূহলী মুখের ভিড় জমবে বেলা শেষের অলস মন্থর চাউনিতে, শোনা যাবে তখন কৃষ্ণগোপালের শীর্ণ গলার আকুতিঃ নিবেন নাকি মাঠাইরেনরা? ও খুকুদিদি নতুন ডিজাইনের শায়া-ব্লাউজ আনছি—

উদাস অলস চোখে তাকিয়ে থাকে সকলে। কেউ উত্তর দেয়। কেউবা উত্তর দেওয়া পছন্দ মনে করে না।

—দেখি কেমন তোমার নতুন ডিজাইন, ভেতরে এসো দেখি বাছা—

বাড়ির ভেতরে গিয়ে আরামের নিশ্বাস ছাড়েঃ আঃ বাঁচলাম! দরদর করে ঘাম পড়ে সারা শরীর বেয়ে, ফতুয়াটা ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। কাঁধের ভেজা গামছায় মুখ মোছে ভালো করে। তারপর বলে ভাঙা গলায়ঃ মাঠাইরেনরা অধীর হইবেন না—একটু জিরাইয়া লই। ও দিদিমণি একঘটি জল দিবেন—বড্ড পিপাসা লাগছে।

ওরে সদা, নিচে একঘটি জল দিয়ে যা তো—খাবার জল।

হাত বাড়িয়ে জলের ঘটি ধরতে যাচ্ছিল কৃষ্ণগোপাল। কে একজন বলল, ওরে সদা, ওপর থেকে ঢেলে দে।

থমকে দাঁড়াল কৃষ্ণগোপাল। তা-ও মুহূর্তের জন্য। অপমানে কানের ডগা তার লাল হয়ে উঠল। কঠিন হল মুখের ভাব, কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্য। আবার ম্লান হেসে তাকাল সেই ভিড়ের দিকে। তারপর হাত ভাজ করে ঝুঁকে পডল সামনের দিকে শির দাঁড়া বাঁকা করে। আর আধহাত ওপর থেকে সদা, কালো তেল চক্‌চকে চাকরটি পরম ঔদাসীন্যে জল ঢেলে দিতে লাগল। পরে মুখ মুছতে মুছতে আবার বলল, মা-জননী, আমারা পশুর অধম হইছি—খাইতে পাই না, পরতে পাই না—কী করুম কন্? প্যাটের জ্বালা বড় জ্বালা। কেউ কথা শুনতে চায় না, আমরা অজাত না। বাড়িতে দোলদুর্গোচ্ছব আছিল এককালে, আর আইজ?—সবই কপাল! কথা কটা বলতে পেরে নিজেকে যেন হাল্‌কা মনে করে কৃষ্ণগোপাল। তারপর আবার বলে, দেখেন মা সকল। কৃষ্ণগোপাল এবার তার জামাকাপড়ের বোঁচকাটা খুলে বসে, এইটা দেখেন অরগ্যাণ্ডির, হাতে ফুল তোলা। না দিদিমণি, ওটা অরগ্যাণ্ডির নয়, ভয়েলের, দেখামু?"

—না, না কালো রঙেরটা দরকার নেই। দেখি, দেখি গোলাপীটা? আর ওখানা ফিকে নীল? ওর নিচেরটা দেখি—তোমার হবে

নাকি দেখ তো ঠাকুরঝি? তোমার গায়ে আবার লাগলে হয়—দিনদিন যা মুটোচ্ছ!

—মা, দেখ বৌদি শনিবার আমায় কেমন খুঁড়ছে!

আকাশ থেকে পড়ে বৌদিঃ কি মিথ্যুক বাবা! বা-রে খুঁড়লাম কখন বলুন তো মা? তাছাড়া আজ তো শনিবার নয় বুধবার।

—ওই একই কথা—শনিবুধে খুঁড়লে অসুখ হয়।

—ও বৌমা, কিনবে তো কেনো না। লোকটাকে শুধু শুধু বসিয়ে রেখেছ কেন? ও তো আবার দুচার দোরে বিক্রি করবে।

—না মা, তাতে কি, তাতে কি—আপনারা দেইখা পছন্দ করেন—

এ-দুটো কত নেবে বলো? গোলাপীটা আর ফিকে নীল—?

মাথা চুলকোয় কৃষ্ণগোপাল। হিসাবের ভান করেঃ আপনাগোর কাছে বেশি চামু না, নেয্য দাম কমু একেবারে? ছয়টা টাকা দিবেন—

—ও মা, বলে কি, ছ টাকা! তবে দোকান থেকে কিনলেই হয়।

—না, হয় না। তাইলে আমরা খামু কী? না খাইয়া মরুম নাকি কাচ্চা-বাচ্চাগো লইয়া? আপনি কত দিবেন কন বৌদিদি? যা থাকে কপালে, না হয় দুই চাইর আনা কম দিবেন। কন দিদি?

—পাঁচ টাকা পাবে, দেবে তো দাও—

মাথা নাড়ে কৃষ্ণগোপালঃ না দিদি হয় না। পাঁচ টাকায় পারি না দিবার—পাঁচ টাকা তো কিনা দাম। দুইটা জামা'য় আটগণ্ডা পয়সা ব্যাপার করুম না তো খামু কী কন্ তো? না, আষ্ট আনাই কম দিয়েন।

—না না, পাঁচ টাকায় দেবে তো দাও।

একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বোঁচকাটা বাঁধতে থাকে কৃষ্ণগোপাল। মুখ বেজার করে বলে, ভাবছিলাম আপনাগো হাতে বউনি করুম, কিন্তু কেমন কইরা দেই? তারপর যেন হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, কইছি যখন আপনাগো হাতে প্রথম কাজ করুম, তখন করুম—নিশ্চয় করুমই। নিয়া নেন—আর চাইর গণ্ডা পয়সা দেন গরিবেরে। কত পয়সা খরচ করেন কত দিকে —গরিবেরে দেন চাইর আনা পয়সা। দাম গুনে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে গেঁজোয় ভরে, তারপর কাঁধে বোঁচকা তুলতে তুলতে বলে, আপনাগো হাতে-প্রথম কাম করলাম, দেখি আপনাগো হাতযশ—

বাইরে এসে আত্মগ্লানিতে ভরে ওঠে সারাটা মন। কেমন করে এমন ব্যবসায়ী হয়ে উঠল সে! এমন তো সে ছিল না, তবে কেন এমন হল? কেন এমন হল?

তারপর সেই দুপুর রোদ। গলানো পিচের রাস্তা। আবার শুরু হবে উন্মাদ পদচারণা। ওজনের ভারে নুয়ে পড়বে পিঠ। রোদে-পোড়া মুখ রুক্ষ। একমুখ দাড়ি। আর সেই করুণ হাঁক, দুপুরের তৃষ্ণার্ত চিলের ডাককেও বুঝি হার মানায়: চাই সেমিজ: ব্লাউজ, শা—য়া—

সারাদিনের বিক্রির হিসাব করে রাত্রে বাড়ি গিয়ে। মহাজনের দামবাবদ টাকাটা তুলে রাখে মাধুরীর কাছে। এতে করে চলে যায় ওদের কোনোমতে। ভালোভাবে থাকার জন্য হাহাকার নেই কারো। না কৃষ্ণগোপালের, না মাধুরীর। শুধু বেঁচে থাকার, শুধু টিঁকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা। বর্তমান জীবনযুদ্ধে জীবন-পণ সংগ্রাম। কোনোমতে মানিয়ে চলতে চায় ওরা—খুঁজে পেতে চায় পায়ের নিচে মাটি—কঠিন, নির্ভরশীল।

কিন্তু লবঙ্গিনী? কি করে সে ভুলবে আদিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। মাটির রঙ মুছে গেছে সবুজ ধানের খেতে। উদার, নীলাভ

আকাশ—। সেই আম জাম-কাঁঠালের বাগান, সেই লিচু, কতবেল গাছের তলায় ছেলেদের উৎসব—আর নারকেল সুপারীর মর্মরিত বন—সেই বেহুলদাস বৈরাগীর গান—কেমন করে ভুলবে লবঙ্গিনী? কেমন করে মুছে দেবে জীবনের সেই-সব গোপন ইতিহাস। কেমন করে থাকবে শহরের ইঁট-কাঠ-পাথরের মধ্যে—পেট্রোল ও গ্যাসকয়লার ধোঁয়ায় আত্মহত্যা করবে লবঙ্গিনী? তার সত্তর বছরের জীবনে সে কি আবার নতুন করে গোড়া পত্তন করতে পারবে? না, লবঙ্গিনী কিছুতেই এ দুঃসহ সত্যকে মেনে নেবে না জীবনে।

প্রাত্যহিক কঠিন জীবন-সংগ্রাম। নিষ্করুণ কঠোর পৃথিবী। দিনান্তের চাহিদার কিছুতেই সামঞ্জস্য আনতে পারছে না কৃষ্ণগোপাল। কালোবরণ ভুরুর মাঝখানে অসংখ্য চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। লড়াই-এর ইতিহাস লেখা হচ্ছে। পুরুষের ভাগ্যকে সে বিশ্বাস করে।

মাঝে মাছে তার অযত্নবর্ধিত চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলে মাধুরী, আহা, তোমার অমন সোন্দর চুলের দশা হইছে কি?

কোনো কথা বলে না কৃষ্ণগোপাল। মাধুরীর একটা হাত টেনে নেয় কপালের ওপর। আশ্চর্য ঠাণ্ডা হাত—ভারি ভালো লাগে কৃষ্ণগোপালের। একগাল ছোট বড় দাড়ি নিয়ে রুগ্ন আর অসুস্থ বলে মনে হয় তাকে। সোহাগে গলা জড়িয়ে ধরে মাধুরী, বলে, তুমি অত খাইটো না—সেই কুন সকালে বাইরাও আর ফিরতে সেই রাইত আটটা—নয়টা এত খাটলে শরীর টিকবনি।

সস্নেহে তাকে আদর করে বলে কৃষ্ণগোপাল: আরে পাগলি, খাটলে আবার শরীর খারাপ হয় নাকি? পুরুষ মানুষে যত খাটব তত শক্ত হইব—

কোনো কথা বলে না মাধুরী। সে অসুখী নয়—এই নতুন পরিবেশের মধ্যেও জীবনকে সে ভালোবেসেছে। মানিয়ে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে একটু ইতস্তত করে মাধুরী। কেমন উস্‌খুস্‌ করে বলে, কাইল সকালে বাইর হওনের আগে র‍্যাশান আইনা দিও কইলাম। চাইল নাই ঘরে—

কোনো কথা বলতে পারে না কৃষ্ণগোপাল। নিঃশব্দে চেয়ে থাকে। মনে পড়ে যায় বহুদিনের পুরনো স্মৃতি। সেই দেশ, সেই মাঠঘাট—আবাল্য-পরিচিত মাটি, অচেনা ফুলের সৌরভ। কোথায় বুকের মধ্যে কেমন করে জড়িয়ে গেছে শিরা-উপশিরার সঙ্গে। কিছুতেই ভোলা যায় না। তবু ভুলতে চায় কৃষ্ণগোপাল। নিঃশেষে মুছে ফেলতে চায় স্মৃতির মণিকোঠা থেকে। বাতিল হয়ে যাক পুরনো দিনের জীর্ণ রূপকথা। মিথ্যে হোক তাকে ঘিরে জীবনের উন্মাদনা। কী প্রয়োজন এই অর্থহীন রোমন্থনের? তার চেয়ে সে শুরু করবে নতুন জীবন নতুন উদ্যমে, নতুনতর পরিবেশে, নতুন করে প্রতিষ্ঠালাভ করবে পৃথিবীতে। কিন্তু কী করে ভুলবে সেই শস্যতীর্থের কথা, সেই অজস্র-রৌদ্র-জল-সিঞ্চিত খেতখামার, সেই আজন্মপরিচিত স্নেহ-শীল মাটি, আর নীলাভ আকাশের দ্যুতি, কালবৈশাখার প্রচণ্ড উন্মাদনা, রৌদ্রালোকিত দিন, রাতের জ্যোৎস্নার প্লাবন, মাঠের ধান—গোয়ালের দুধ, ঘরের শান্তি, লোকজন—চাষাভূষো সবাই আজ উল্লেখযোগ্য। কাকে ভুলবে সে—কাকে? কাকে মুছে ফেলবে জীবনের সকল দিক থেকে? কারা তাকে নিবিড় করে আত্মীয়ের মতো আগলে রাখছে? জীবনে কাকে মিথ্যে বলবে সে? একটা নিশ্বাস ফেলল কৃষ্ণগোপাল।

সকালে রেশন আনতে যাবার সময় চুপিচুপি আলোচালের কথা জানায় মাধুরী। বাইরে বারন্দার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারা করে বলে, ঠাকুমা ওইখানে মালা জপ করে চ্যাঁচাইও

না কইলাম, তাইলে অক্ষুনি বুড়ি আইয়া পড়বো। তারপর আবার ফিসফিস করে বলে, দুই দিন ধইরা বুড়ি মুড়ি চিবাইতে লইছে, কয়—আর পারি নারে নাত বৌ, কিষ্টা কবে আমারে ছ্যাশে রাইখা আসব—ভারি কান্দাকাটি করতে আছে বুড়ি।

কোনো কথা বলে না কৃষ্ণগোপাল। শুধু হাত বাড়িয়ে থলেগুলো টেনে নেয়। শেষকালে যেন থাকতে না পেরে বলে, আমারে একটু পাও রাখনের সময় দাও—বলে প্রায় নিঃশব্দগতিতে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল কৃষ্ণগোপাল। চিনি, চালের থলে নামিয়ে রাখতে রাখতে আড়চোখে তাকাচ্ছে মাধুরীর দিকে।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মাধুরী, বলল, পাইলা নাকি, দুই চাইর সের চাইল ?

হতাশ হয়ে বলেছে কৃষ্ণগোপাল : না, পাওয়া গেল না, দোকানে আতপ চাইল নাই—। তারপর মাধুরীর অনেক কাছে সরে গিয়ে বলেছে, কী করা যায় কও তো? কী বিপদেই না পড়লাম—

মাধুরী ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, আমি তার কী করুম কও তো ?

—আইজো না হয় মুড়িচিড়া দিও—

—আর কয়দিন মুড়ি চিবাইতে পারে বুড়া মান্‌ষে—দুই দিন ধইরা মুড়ি খাইয়াই আছে ঠাক্‌মা, যেইদিন আলো চাইল ফুরাইছে সেইদিন থিকা—

মুহূর্তে কী যেন চিন্তা করে কৃষ্ণগোপাল। আকাশ-পাতাল এক মুহূর্তের জন্য, তারপরে বলে, বুড়ি তো চোখে দেখে না ভালো, এক কাম কর—সিদ্ধচাল দুগা ফুটাইয়া দাও—

অবাক হয়ে মাধুরী তাকায় স্বামীর দিকে। বলে, কও কি, তোমার মাথা খারাপ হইছে? বিধবা মাইন্ষেরে সিদ্ধচাল দিতে পারুম না।

—আরে, বুড়ি চোখেই দেখে না ভালো কইরা। উত্তেজিত হয়ে বলল কৃষ্ণগোপাল, একটা কামও যদি হয় তোমার দিয়া—

কিন্তু না, মাধুরী কিছুতেই রাজী নয়। পারবে না, কিছুতেই পারবে না বৃদ্ধা লবঙ্গিনীকে সে ভাত দিতে—পারবে না দিতে—পারবে না দিতে সিদ্ধচালের একগাদা ভাত।

পরদিন ভোরবেলা আর পাওয়া গেল না লবঙ্গিনীকে।

মাধুরীর ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভাঙল কৃষ্ণগোপালের। প্রথমে অবাক হয়ে শোনে যেন—কিছুই সে বুঝতে পারছে না। শুধু কানের কাছে বেজে চলেছে কার যেন সেতারের আলাপ: কিন্তু বুড়িরে য্যান আর পাওয়া যাইতেছে না—কে যেন বলল। বোধহয় মাধুরী।

ধড়মড় করে এবার বিছানায় উঠে বসল কৃষ্ণগোপাল। তারপর মনে পড়ল সেই গ্রাম, রূপকথার মতো মিষ্টি আর রহস্যময় যার হাতছানি। সকালের আকাশে যার নিরুদ্দেশ অজস্র মেঘ, দুপুরের আকাশে যার অকৃপণ সূর্যের সোনালী আলো। সন্ধ্যার পশ্চিমে অপূর্ব সূর্যাস্ত যার। মাঠে মাঠে ধান, অজস্র পাখির ডানার শব্দে মুখরিত চারিদিক। আর তাই লবঙ্গিনীকে মুক্তি দেয়নি বুঝি এরা।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নিচে নামল কৃষ্ণগোপাল। তারপর উন্মাদের মতো ছুটে চলল। সারাদিন নাওয়া নেই, খাওয়া নেই প্রতি মুহূর্তেই অন্বেষণ। লবঙ্গিনীকে সে খুঁজে বার করবেই। কোথায় সেই বৃদ্ধা মুড়ি খেয়ে যে দিন কাটাচ্ছে।

সারাদিন খুঁজে ব্যর্থ হয়ে ফিরবার সময় হঠাৎ দেখা গেল কে যেন বসে আছে, লবঙ্গিনী না? রাস্তার ধারে ফুটপাথে বসে আছে লবঙ্গিনী। উন্মাদ ব্যস্ততায় ছুটে গেল কৃষ্ণগোপাল: ঠাক্‌মা! জড়িয়ে ধরল লবঙ্গিনীকে।

ক্লান্তিতে চোখ বুজে নিশ্বাস ফেলছিল লবঙ্গিনী। চোখ মেলে বলল, কে রে, কিষ্টা!—যাইতে পারলাম না রে আর, যাইতে পারলাম না— ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বুড়ি লবঙ্গিনী।

—কোথায় ঠাক্‌মা, দ্যাশে? জিগ্যেস করল কৃষ্ণগোপাল।

মাথা নাড়ে বুড়ি: তর ঠাকুর্দারে যেইখানে রাখছে, সেইখানে বুঝি আর যাইতে পারুম না—সত্তর বছরের বুড়ির কোঁচকানো গাল বেয়ে জলের ধারা নামছে। চিক্‌চিক করছে যেন।

কী একটা অসহ্য ব্যথায় সমস্ত শরীরটা কুঁচকে আসে কৃষ্ণগোপালের। শক্ত দু'হাতে লবঙ্গিনীকে চ্যাঙ্‌দোলা করে বুকের কাছে আনে। থরথর করে কেঁপে উঠে ঠোঁট: তোমারে আবার নিয়া যামু ঠাক্‌মা। আমাগো সোনার দ্যাশ আমরা ভুলি নাই—আমরা আবার ফিরা যাইতে চাই—।

সূর্যমুখী

সকালে—ঠিক সকালে নয়—তারও কিছু আগে তখনও কোমল ঈষদুষ্ণ রোদ সামনেকার ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের পাতায় পাতায় আলোর উৎসব শুরু করে নি। প্রত্যেকদিন ঠিক সেই সময় একটা আর্ত চীৎকারের মত শব্দ ক'রে ডায়মণ্ডহারবার লাইনের ওপর দিয়ে কোন প্যাসেঞ্জার অথবা মালগাড়ীর হুইসিল আছড়ে প'ড়ে ভোরের অস্পষ্ট রহস্যময়তার মধ্যে—

আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেন মণিকুন্তলা। বুকের ভেতরটায় একটা রুদ্ধ আবেগ তোলপাড় করতে থাকে। আস্তে বিছানায় উঠে বসেন মণিকুন্তলা।

জানালার গরাদ ডিঙিয়ে ঝলকে ঝলকে হাওয়া এসে আছড়ে পড়ে। ফুলকাটা পর্দা ফুলে ওঠে নৌকার পালের মত। গাছের পাতায় পাতায় মৃদু সুর বেজে ওঠে। আর দূরে দূরে ইলেকট্রিকের ম্লান আলোর আভাষটুকু চকচকে এ্যাসফলটের ওপর আঁষের মত জ্বলতে থাকে যেন। সকালের সহস্র লোকারণ্যে সাদার্ণ এ্যাভিন্যুর অপূর্ব রূপ আছে কিন্তু ভোরের আবছা ফিকে আলোয় আরও এক রূপ আছে সেও অনন্য সাধারণ।

কতক্ষণই বা লাগে বালিশের পাশে রাখা চশমা হাতড়ে হাতড়ে বার করতে। আস্তে আস্তে নিজেকে বিলিয়ে দেন নিস্তব্ধতার মধ্যে। বাইরে যেন একটু ঠাণ্ডা, ভাবলেন মণিকুন্তলা—হ্যাঁ, তা হবে। শীত শীত করছে যেন। আলতো হাতে শাড়ীর আঁচল গায়ে জড়িয়ে নিলেন।

মাঝে মাঝে দ্রুতগামী গাড়ীর আওয়াজ আসে। শুধু চাকায় চাকায় দীর্ঘ হাহাকারের শব্দ সাদার্ণ এভিন্যুর কালো পিচের ওপর দিয়ে ছুটে যায়।

আরও কিছুক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধ স্বাস্থ্যান্বেষীদের দেখা যাবে লাঠি হাতে ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে চলেছে লেকের দিকে। তারপরেই দেখা যাবে পূর্ব কোনের আকাশে অস্পষ্ট আলোর আভা। আকাশে ইতস্তত বিব্রত রক্তাভ মেঘ। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল যাবে ফুটবল নিয়ে আর প্যারাম্বুলেটার ঠেলে আনবে নেপালী ও ভুটিয়া আয়ারা সাদা ফুট-ফুটে একদল ননীর মত ছেলেমেয়ে তাদের সঙ্গে। কালো ঝকঝকে চোখ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, লাল ঠোঁটে যেন—এক ঝাঁক পাখী কিচিমিচির করে ভরে তুলেছে সাদার্ণ এভিন্যুর আকাশ।

এবার মনে পড়ে সাগরের কথা। সেও এমনি এক শিশু, একদিন তাকে পেয়েছিলেন মণিকুন্তলা। একমুঠো মাখনের মত নরম—তুলতুলে। শ্যামলবর্ণ—কালো চুলের ভারে মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে যেন। আরও আশ্চর্য তার কালো চকচকে চোখ। ভারী মায়া লাগত মণিকুন্তলার। কিন্তু সে কোথায় হারিয়ে গেল। কোথায়? সিলিন্ড্রিক্যাল চশমার কাঁচ যেন ঝাপসা হয়ে এল। তাকে কোনদিন আর কাছে পাওয়া যাবে না। আগের মতন তাকে কাছে এনে বুকের কাছে আপন করে আর পাওয়া যাবে না। সে শুধু এই আশ্চর্য সকালের মতন, শুধু হৃদয়ের অনুভবের চেতনায় সপ্তরঙের বেদনায় রামধনু হয়ে আছে।

কাঁসারী পাড়ার বাড়ীতে তার সেই পলেস্তরা খসে পড়া নোনাধরা দেয়ালে দেয়ালে কয়লায় লেখা তার নাম—তার গায়ের গন্ধ কোলের অন্ধকারে যেন জমে আছে। সেখানে থাকতে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে মণিকুন্তলার সাগরের ছেলেমানুষী বয়সের লুকোচুরী খেলার

ডাক। যেন অকস্মাৎ কোন সন্ধ্যায়, কখনও নির্জন দগ্ধদুপুরে অথবা কখনও মধ্যরাত্রে আছড়ে এসে পড়েছে চেতনার দেয়ালে।

তারপরও দশ বছর কেটে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মণিকুন্তলা আর অনিলেন্দুর ভাগ্য তাদের কাঁসারী পাড়া থেকে এসে পড়ল সাদার্ণ এভিন্যুর প্রাসাদে।

ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা উড়ছে।

অনেকক্ষণ ধরেও হুস নেই যেন মণিকুন্তলার। আকাশের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। আকাশ কি আশ্চর্য নীল। সাদার্ণ এভিন্যু প্রাণস্পন্দনে ভরে উঠেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন মণিকুন্তলা সামনেকার দৈত্য প্রায় গাছের পাতায় ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে সকালের সূর্যের আলো মোটা আর পুরু লেন্সের ওপর।

মালিরা ততক্ষণে এসেছে ফুলগাছের তদারকে। চেয়ে দেখলেন অদ্ভুত দুটি ডালিয়া ফুটেছে। দুটি তারার মত জ্বলছে। এখুনি হয়ত তুলে আনবে মালি। সাজিয়ে দেবে অনিলেন্দুর পড়ার টেবিলের ওপর। বারণ করবেন নাকি ? উঠে দাঁড়ালেন মণিকুন্তলা।

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই অন্ধকারে চোখ ধাঁধিয়ে গেল খানিকটা। কার্পেটের ওপর সবুজ ভেলভেটের চটি হল নিস্তরঙ্গ। পাখাটা ঘুরছে বন্‌বন্ করে। তারই একটা অস্পষ্ট শন্‌শন্ ব্লেডের হাওয়াকাটা আওয়াজ ঘরের মধ্যে। ঘড়ির কাটার গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাইরের আলোর প্রখরতা বাড়ছে। ডায়েলের ছয়ের ঘর পেরিয়ে কাঁটা অনেকদূর পাড়ি জমিয়েছে। বাতাসের দমকে ঘরের পর্দার ওঠানামায় নজরে পড়ল অনিলেন্দুকে। মেহগেনি পালঙ্কের গদিতে ডুবে আছে শ্বেত শুভ্র বিছানার চাদরের ওপর। ভাবলেন যেন অনেকদিনের চেনা একটা দৃশ্যের কথা, বারবার মনে হতে লাগল। আর কাল রাতের প্রায় শেষ অঙ্কে বাড়ী ফিরেছে অনিলেন্দু। তখন

তার নিজের দোতলার এই ঘরে মণিকুন্তলার কাছে উঠে আসার ক্ষমতা ছিল না মোটেই।

ভারী পাতলা ঘুম মণিকুন্তলার। তার ওপর যেদিন অনিলেন্দুর ফিরতে রাত হবার সম্ভাবনা থাকে অথবা রাত হয়—ফটক থেকে গাড়ী বারান্দার তলায় আসতে যতটা গ্র্যাভেল মাড়িয়ে আসে অনিলেন্দু তার গাড়ীর চারটে চাকার পায়ে, তাই যথেষ্ট—তাতেই ঘুম ভেঙে যায় মণিকুন্তলার।

আজ সকালে এই প্রথম অনিলেন্দুর দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল, কাল রাতে হরদয়াল সোফার তাকে প্রায় চ্যাংদোলা করে ঘরে তুলে দিয়ে গেছে। সাদা পাট ভাঙা পাঞ্জাবী—ভেঙে কুঁচকে গেছে। এখানে সেখানে ঝোলের দাগ—মাংসের লালচে গাঢ় জুসের। বিশৃঙ্খল পরণের কাপড়—

চোখ বুজলেই ছায়াছবির মতন চোখের সামনে দিয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল ফেলে আসা জীবনের ঘটনা।

কাঁসারী পাড়ার সেই ছোট্ট বাড়ীটা আর তার চুণবালি খসে যাওয়া অন্ধকার দেয়ালের নানা আকৃতির রেখাচিত্র। মনে পড়ল পশ্চিম-দিকের জানালার সামনে ছুতোরদের শ্যাওলা পড়া পাঁচিল আর তার ওপর মাথাতোলা নধর অশ্বত্থ চারা। সকালের রোদে ভারী অদ্ভুত কচি মনে হত তার সবুজ পাতা। ছোট্ট তক্তপোষে এক রাশ ছেঁড়া ময়লা বিছানা। তারই ওপর নিঃশব্দে নিঃসঙ্কোচে ঘুমিয়ে আছে অনিলেন্দু। মাথার দিকে মহাত্মার ডাণ্ডি যাত্রার একখানা ছবি। যা প্রত্যেকদিন অনিলেন্দুকে উৎসাহ জুগিয়েছে কর্মের, দেশপ্রেমের আর প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে। তারপর আরও অস্পষ্ট, আরও ছাড়া ছাড়া কয়েকটা ছবি। কর্মী অনিলেন্দুর নাম প্রথমে পাড়ায়, পাড়া থেকে জেলায়, তারপর জেলা থেকে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ল কাজকর্মের মধ্য দিয়ে।

সাওয়ারের ঠাণ্ডা জল মাথায় পড়তেই চমক ভাঙল মণিকুন্তলার। ও—এতক্ষণ কি সব ভাবছিলাম ? পুরনো দিনের বাতিল হওয়া ইতিহাসের রোমন্থন। সাদা ধপধপে বাথটবে নিজেকে ডুবিয়ে মনে মনে ভাবলেন সেদিন যেমন মিঃ সেনের বাড়ীতে দেখে এলেন সে রকম হটওয়াটার বয়লারের কথা অনিলেন্দুকে বলবেন কিনা লাগাতে। তা না হলে শীতকালে ভীষণ অসুবিধা হবে নিশ্চয়।

স্নান সেরে প্রসাধনের পাট সাঙ্গ করে বাইরে আসতেই ঠাকুর প্রাতরাশের চা নিয়ে এল। রুটিতে জ্যাম মাখাতে মাখাতে ভাবলেন মণিকুন্তলা এবার সত্যি ডাকবেন নাকি অনিলেন্দুকে। কিন্তু কিছু ঠিক করার আগেই একটা নাইট গাউন গায়ে চাপিয়ে কোমরে সিল্কের ফিতেটা আঁটতে আঁটতে এসে দাঁড়ালেন অনিলেন্দু। কাল রাতের বিশৃঙ্খলার চিহ্ন সুস্পষ্ট চোখে মুখে আর অবিন্যস্ত চুলে—

রুটিতে জ্যাম মাখানো বন্ধ রেখে মুখ তুলে তাকালো মণিকুন্তলা অনিলেন্দুর দিকে। তার শরীরের দিকে। তার মুখের দিকে।

—ও অনেক দেরী হয়ে গেল বুঝি মণি আমার ? ডাকলে না কেন ? ভারীস্বরে সামান্য জড়তা রয়েছে বুঝি এখনও।

মণিকুন্তলা হাতের রুটি নামিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপর। তারপর জ্যামের চামচে। টিপটের ওপরের পশমের ঢাকনাটা একবার তুললেন। আবার রেখে দিলেন। আকাশের দিকে তাকালেন।

সোনালী রোদ ইউক্যালিপটাস গাছের মাথায়। কয়েকটা যাযাবর মেঘ যাত্রা করেছে দূর দিগন্তে। তারপর দৃষ্টি ঘুরে এল কাছের অতি পরিচিত জনের মুখের ওপর : ভাবলুম কাল রাতে অত দেরী করে ফিরলে তাই আর—চা খাবে ? শুধালেন মণিকুন্তলা।

—ও, হ্যাঁ,—সে এক কাণ্ড, কাল রাতে রামজি প্রেমজির পার্টিতে গেলাম। সে তো তোমাকে বলেই গেছি। তারপর সেখানে দেখি

সেনট্রালের রথিমহারথিদের। ফাইনান্সের রাও, ইণ্ডাষ্ট্রীর চেট্টি, লোনের সিং সবাই হাজির। তাছাড়া এখানকার রথিরাও উপস্থিত। সেন, নস্কর থেকে—

একহাতে টিপটের ঢাকা তুলে জিগ্যেস করলেন মণিকুন্তলা: কিন্তু তুমি চা খাবে?

—চা! অবাক হয়ে বললেন অনিলেন্দু: চা—দেবে? তা দাও—হ্যাঁ, যা বলছিলাম মিঃ ঘোষ এল আমার সঙ্গে। আলাপ করিয়ে দিতেই ওরা সকলে—

আবার তাকে বাধা দিয়ে বললেন মণিকুন্তলা: কিন্তু তোমার চা—

—চা? হ্যাঁ—দাও দাও—শোন তারপর হল কি—

এবার ঝঙ্কার দিলেন মণিকুন্তলা: এখন থাক, আগে যাও বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এস। চা জুড়িয়ে গেল যে—

কিন্তু তারপর যা হোল তা যদি—বলতে বলতে উঠে পড়লেন অনিলেন্দু। চললেন বাথরুমের দিকে।

চায়ের শেষ চুমুক দিয়ে টেবিলের ওপর কাপটা ঠেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন অনিলেন্দু। চেয়ারের পিঠে শরীরটাকে আরামে এগিয়ে দিয়ে আবার শুরু করলেন: হ্যাঁ, আমি ওদিকে লোনের সিংকে ঘোষের থুরু দিয়ে বলতে কাজ হল। খুব খাতির করে বললেন, আপনার নাম অনেক শুনেছি। এমন কি বাপুর মুখেও আপনার প্রশংসার বিরাম ছিল না। তারপর লোনের কথা পড়তেই একেবারে দেড়কোটি হাকরে বললাম। বললাম, এর ওপরেই আমার মঙ্গল পটারীর ভবিষ্যৎ! এবং ওটার জন্য আমি অবশ্য ফরেন এক্সপার্টদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়েছি, তাতে যে এষ্টিমেট—আপনি যদি কাগজ দেখতে চান ত—

আরক্তমুখে মণিকুন্তলা একবারমাত্র বললেন: তোমার পটারী আবার কবে হল, শুনি নি ত?

হা হা করে হাসলেন অনিলেন্দু: আগে ছাই আমিও কি জানতাম কিন্তু লোন চাইবার সময় দরকার হল যে, তা পটারীর কথা মনে পড়ল, তাই বলে দিলাম।

—তারপর যখন কাগজপত্তর দেখতে চাইবে, তখন? তার চেয়ে ভেজিটেবল প্রোডাক্টস্‌টাই ভাল ছিল। একি ভাল হচ্ছে, শেষকালে একটা কেলেঙ্কারী হবে, কাগজে কাগজে লেখালেখি হবে শেষকালে—

—মাথা খারাপ তোমার—তারপর আবার কি ভেবে বললেন: স্ক্যানভাসের ভয় করলে কি চলে, না কিছু করা যায়? সিনড্রি ফার্টিলাইজারের কথা ভুলে গেলে না মেননের জীপ স্ক্যানভাস কেউ ভুলেছে—কিন্তু তাতে কি তার ইউ, এন, ও তে যাওয়া মুলতুবী থাকল?

—কিন্তু জনসাধারণের টাকা এমনভাবে অপব্যয় করা কি উচিৎ হচ্ছে? একদিন এর জবাবদিহি করতে হবে না, তখন?

মণিকুন্তলাকে থামিয়ে দিয়ে অনিলেন্দু বললেন: এখন এত ভাবলে কি আর কিছু করা যাবে? এই ত দু পয়সার রোজগার করার সময়। তা ছাড়া আর কদিনই বা হাতে আছে—

কিন্তু তাই বলে এমন করে জনসাধারণের টাকা অপব্যায়ের পরেও আশা রাখো আরও একটা চান্সের? দুরাশা ত কম নয়।

নতুন আরও একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন অনিলেন্দু: আমরা একটু আশাবাদী কুন্তলা। কিন্তু সে যাক—আসল কথা যা বলব ভেবেছিলাম। শ্রীরাম ঘৃত দেখেছ ত? খবরের কাগজে প্রচুর বিজ্ঞাপন ছাপে প্রত্যেকদিন। মালিক হনুমান দাস আর লছমি প্রসাদ দু জনে। ওরাই আবার ওষুধের ডিষ্ট্রিবিউটর। বেচারারা আবার দু দুটো কেসে জড়িয়ে পড়েছে মিছিমিছি।

—আমি জানি, কালকে না পরশুর কাগজে দেখেছিলাম বটে, ভাববে ভাবতে বললেন মণিকুন্তলা।

—দেখেছ কাগজওয়ালাদের বদমাইসি? এরই মধ্যে ফাস করেছে? যাই হোক এদের একটা ব্যবস্থা করে দেব। অনেক করে ধরেছে। ঘোষ বললেন, করে দাও সেন; ওদের সঙ্গে তোমার তো দহরম্ মহরম্ খুব। আর কামিয়ে নাও মোটা হাতে জোরজার করে। তারপর থেমে একটু হেসে বললেন অনিলেন্দু: বাঙ্গালীর দফা সারল শালারা। শ্রীরাম ঘৃতের শতকরা পাঁচ ভাগ ঘি, শতকরা পঁচিশ ভাগ ভেজিটেবল আর সত্তর ভাগ চর্বি জাতীয়। ব্লেণ্ড করে প্রচুর পয়সা লুটছে শালারা। আমিও ছাড়ব না—কষে আদায় করে নেব—

—এদের জেল হওয়া উচিৎ। নিঃসন্দেহে বললেন মণিকুন্তলা। পরক্ষণে আবার বললেন: জেল। শুধু জেল নয় এদের একেবারে ফাঁসি হওয়া উচিৎ।

একটু হেসে বললেন অনিলেন্দু: তুমি বড় উত্তেজিত হয়েছে কুন্তলা; আমাদের দেশে তা হবার নয় যখন—তখন যতটা পারা যায় এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিৎ।

মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় বললেন মণিকুন্তলা: না কখনো না, এদের মঙ্গল কামনা পাপ নয় শুধু, অপরাধ—

তারপর উঠে দাঁড়ালেন হতবাক অনিলেন্দু। একটু থেমে চেঁচিয়ে বললেন: তোমার ইঙ্গিত বুঝলাম। কিন্তু আমার জন্যেই কাঁসারী পাড়ার এঁদোপাঁক থেকে এখানে উঠে আসতে পেরেছ—

—তারজন্য অনেক কঠিন মূল্য আমাকে দিতে হয়েছে, তার খোঁজ ত তুমি রাখবে না—রাখার কথাও নয়।

অসহিষ্ণু হয়ে বললেন অনিলেন্দু : আমি জানতে চাই না, অমি কাজ বুঝি—উঠে গেলেন অনিলেন্দু। তারপর দাঁড়ালেন গিয়ে সাদার্ণ এভিন্যুর ওপরের ব্যালিকনিতে।

মণিকুন্তলাও উঠে গেলেন এক সময়। আহতনীল মুখখানা সকালের উজ্জ্বল রোদে বিষণ্ণ প্রতিমার মত দেখাচ্ছে।

তারপর কি দুঃসহতায় দিন কেটেছে তার। বাইরে অফুরন্ত কাজ অনিলেন্দুর। সকালে বেরিয়ে গেছে কখনও অথবা দুপুরে আবার কখনও সন্ধ্যায়। সমস্ত রাত্রি কেটেছে সাদার্ণ এভিন্যুর এই আইভিলতায় ঢাকা বাড়ীটায় বা অন্য কোনখানে। আবার কখনও অনেক রাত্রে প্রায় ভোর অথবা আরও কিছুক্ষণ আগে গাড়ীর চার চাকায় মর্মরিত হয়েছে গেট থেকে গাড়ী বারান্দার দূরত্বটুকু। অ্যাল-সেসিয়ানটা অকারণে চেঁচিয়ে অকস্মাৎ চুপ করে গেছে।

তবু একদিন ভোরে—চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। শীতের মধ্যে শুধু গেঞ্জি গায়ে ছুটে এলেন অনিলেন্দু নিচে। গেটের কাছে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ভেতরে মণিকুন্তলা বসে আছেন। একটা ছোট এ্যাটাচি কেসে কয়েকখানা বই আর জামা কাপড় কয়েকখানা।

অনিলেন্দু বললেন : মণি তুমি ক্ষমা করো—নেমে এসো—

ম্লান হাসলেন মণিকুন্তলা : তা আর হয় না—তুমি খালি গায়ে এসেছ ঠাণ্ডা লাগবে যে।

আমি—আমি—অসংলগ্ন মনে হল অনিলেন্দুর কথাগুলো : তুমি কোথায় যাচ্ছ কুন্তলা ?

—একটা শিক্ষয়িত্রীর চাকরি পেয়েছি বীরভূমের গণ্ডগ্রামে। সেখানেই যাব—

—তোমার কষ্ট হবে কুন্তলা, তুমি নেমে এসো—তুমি নেমে এসো—

—অনেক দেরী হয়ে গেছে। আর হয় না।

—আর হয় না? আর্তের মত বললেন অনিলেন্দু।

—না গো! আর হয় না। আমাকে যেতেই হবে।

—কিন্তু কেন? কি জন্য আমি এত প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করলাম, কার জন্যে করলাম?

এবার কোন উত্তর না দিয়ে মণিকুন্তলা গায়ের চাদরখানা খুলে অনিলেন্দুর হাতে দিয়ে বললেন: গায়ে দাও, তা না হলে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।

চীৎকার করে উঠলেন অনিলেন্দু: তুমি কি আর আসবে না? কোন দিনও না?

আর্দ্র গলায় বললেন মণিকুন্তলা: তুমি সুস্থ হও, আত্মস্থ হও—সৎ হও, এই আমার প্রার্থনা—

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অনিলেন্দু সেইখানে। শুধু অনেক দূর পর্যন্ত টাক্সির পেছনকার লাল আলো দুটো সাদার্ণ এভিন্যুর দিকে তাকাতে তাকাতে এক সময় নিঃশেষ হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে অবাক লেগেছে দেবীদাসের। অবাক লেগেছে ড্যালহাউসির চওড়া রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে। অবাধ্য বিস্ময়ে চোখের তারা ঠিকরে পড়তে চেয়েছে। বাঁকা শীর্ণ ঘাড় তুলে প্রশ্ন করেছে। পৃথিবীতে এত অন্যায় এত অবিচার—

শীতের দুপুর। সূর্যের অকৃপণ আলোর বৃষ্টি। রাস্তার পিচ তেতে আগুন আর এখানে ওখানে পুরনো ঘায়ের মত ফুলে উঠেছে যেন।

মাথার ভেতরটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে দেবীদাসের। দপ দপ করছে রগের কাছটা। ভাল করে মনে পড়ছে না কিছু। কেমন আচ্ছন্নের মত লাগছে। একবার জিভটা চুষল দেবীদাস। মুখের থুতু শুকিয়ে কেমন আটা হয়ে গেছে। চট্ চট্ করছে মুখের ভেতরটা। জল—এক গ্লাস পেলে হয়ত কিছু ভাল হত। একবার এদিক ওদিক তাকায় দেবীদাস। একটা জলের কল—একটা জলের কলও নেই কাছে পিঠে। কি অসহ্য তৃষ্ণা? বুকের ভেতরটা যেন ফেটে যেতে চাইছে।

কাপড়ের কোঁচা দিয়ে মুখ মুছল দেবীদাস। কেমন জ্বালা জ্বালা করছে মুখের চামড়া। একটা অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে কোন অলৌকিক শক্তিতে একটা ভীষণ কিছু—

মাঝে মাঝে কি যেন মনে হয় দেবীদাসের। কেমন যেন করে সারা শরীরটা মনে হয় অব্যক্ত জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা। ইচ্ছে করে ভীষণ একটা চীৎকারে কেঁদে ওঠে—নিজের ওপর কেমন বিশ্রী ধারণা চেপে বসে—সে বুঝি সত্যি পাগল হয়ে গেল? নিজের

হাতে একবার মাথাটা নাড়া দেয় দেবীদাস। ঝিম্ ঝিম্ করছে মাথার ভেতরটা। একবার এদিক ওদিক তাকায়। নাঃ সবই ত চিনতে পারছে। ওই ত একটা গাড়ী চলে গেলে ঝলসে গেল দুপুরের রোদ। চিড় খেল হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে। ওই ত আরো একটা। ভেতরের লোকগুলোকে চোখে পড়ল। কি যেন নাম প্যাকার্ড! ওই ত আরো একখানা। এখানা বুইক। সামনের বাড়ীখানা নীচ থেকে ওপরতলা পর্যন্ত গুনে গেল দেবীদাস। না মাথার গোলমাল নেই। তবে—

আবার অসহ্য তৃষ্ণার ভাবটা যেন বুকের ভেতর চাড়া দিয়ে উঠল। জিভটা টানছে ভেতরের দিকে। একবার মুখের থুতু দিয়ে দুপুর রোদের ফাটা ফাটা চামড়া ওঠা ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নিল দেবীদাস। পেটের ভেতরটা যেন কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। মনে হল পেটের সমস্ত নাড়ীগুলো কে যেন টানাটানি করে জট খুলতে গেছে। দু'হাত দিয়ে পেটটা চেপে ধরে দেবীদাস। একবার নয় দুবার নয় অনেক—অনেকবার পকেট হাতড়ে দেখেছে দেবীদাস। টিপে টিপে, নেড়ে দেখেও সন্দেহ যায় নি। পকেটের ভেতরকার কাপড় টেনে বার করেছে কিন্তু না—দু,চার আনা পাওয়া ত দূরের কথা একটা ফুটো তামার পয়সা পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

তবু কেন জানি আবার পকেটে হাত দিল দেবীদাস। ভুল হতেও ত পারে? অন্তত একটা কিছু পেটে দেবার মতন থাকলেই চলবে। অন্তত দু'আনা না হউক চারটে পয়সা কিংবা একটা পয়সা থাকলেই চলবে। ওই ত দূরে একটা চিনেবাদামওয়ালা গাছের ছাওয়ায় ঝুড়িটা নামিয়ে বসেছে। আরো কিছু দূরে দু' একজন ছোলা মটর সেদ্দ নিয়ে বসে আছে। এখান থেকে দেখতে পায় দেবীদাস। একটা চেনা স্বাদ, কেমন সোদা গন্ধ আর ঝাল নুনের চিরপরিচিত গন্ধ জিভের ডগায় শিরশিরানি আনে—

এক একবার লজ্জার মাথা খেয়ে ভিক্ষে করতে ইচ্ছে করে দেবীদাসের। ইচ্ছে করে বেশ একটা চকচকে গাড়ীর মালিক দেখে হাত পেতে বসে—

ভিক্ষে করা এর চেয়ে কি লজ্জাকর ? এর চেয়েও কি ঘৃণার ? দূরে চানাচুরওয়ালা আশে পাশে অফুরন্ত লোকজনের ব্যস্ততা, অবিরাম নতুন নতুন মডেলের গাড়ীগুলো ছিটকে যাচ্ছে দুপুরের রোদে আর তার অরোহীরা কেমন মোটা মেদবহুল চেহারা, দুপুরের বিশ্রাম ফোলা চোখে আর অবিন্যস্ত চুল। তাদের কাছে গিয়ে হাত পেতে ভিক্ষে চাইবে দেবীদাস ?

ওই ত নামল একজন গাড়ী থেকে। দেবীদাস ডাকল : এ জি শুনিয়ে, জেরা শুনিয়ে—

অবাক হয়ে ফিরে তাকল লোকটা। চোখে মুখে অবহেলার ভাব। দেবীদাস কি চাইবে কিছু? সামান্য কয়েক আনা ? ওই ত দূরে চানাওয়ালা বসে আছে এখনো। ঝাল নুনের স্বাদটা জিভের আগায় কেমন সুর সুরানি দিতে সুরু করে। হঠাৎ মনে পড়ে বাড়ীর কথা—চোখের সামনে ছবির মত ভেসে ওঠে কতকগুলো রুক্ষ মুখ। মায়ের চোখের ভুরু তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে কঠিন জিজ্ঞাসায়, একটা কঠোর প্রতিজ্ঞায়—। অথর্ব বাবা—অপ্রাচুর্য যাকে সংগ্রামী করে তুলেছে। আরো আছে কুমারী বোন, স্কুল ছাড়ানো বকাটে ভাই—দৈনন্দিন সংগ্রামের নির্মম সৈনিক।

চমকে পেছিয়ে আসে দেবীদাস। একি করতে যাচ্ছিল ? কার কাছে হাত পাতছিল সে ? পুরু মাংসের নীচে একটা কুৎসিৎ মাংসাসী মুখ যেন দেখতে পেল দেবীদাস। লাফিয়ে সরে এল। থুতু ফেলল খানিকটা পরম ঘৃণায়।

লোকটা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে! তারপর কি যেন বিড় বিড় করে বকতে বকতে চলে যায়।

দূরে গাছের পাতা দুলছে। শীতের আমেজে ছোট বেলা ফুরিয়ে আসছে ক্রমে। গাছের পাতায় বিদায়ী দুপুরের অপূর্ব বর্ণোৎসব।

মনে পড়ে মায়ের কথা। হতাশায় ফ্যাকাশে চোখের তারায় কেমন ড্যাবড্যাবে চাউনি। তবু কেমন কঠিন বিদ্রোহ এই দুঃসহ জীবনের ওপর। আজও কি খাওয়া হয়নি মায়ের? ভাত জোটেনি একমুঠো সকলের খাওয়ার পরে? ছোট ভাইটা কাঁদছে নাকি এক ফোঁটা বার্লির জন্য? আরো একটা মেয়ের কালো আর শান্ত চোখের চাউনি নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে সমস্ত দারিদ্র আর এই পুঁজিবাদী সমাজের সমস্ত অন্যায়?

একবার এই সময়ে, এই আগুন দুপুরে, কর্মক্লান্ত শহর, আকাশ চুম্বী· প্রাসাদমালার ওপরে অলস পায়রার ডাক। ট্রামের তারে দোল খাচ্ছে দু'একটা কাক। গাছের পাতায় অদ্ভুত আলোয় সোনা সোনা রং। একবার নুটুবিহারী বাই লেনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে এই প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে দেখতে সেখানকার সমস্ত হাহাকার, কান্নার ইতিহাস। সমস্ত ব্যর্থতার ইতিকথা সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে।

—এই যে দেবীবাবু এখানে কি করছেন?

অবাক হল দেবীদাস। ভারী অবাক লাগল। ফিরে তাকাল। আরে অনুপমা, কতদিন দেখিনি তোমায়। আকাশের উজ্বল প্রচ্ছদ-পটে সূর্যের আলো ঠিকরে আসছিল এতক্ষণ। তার তেজ কি আস্তে আস্তে কমে আসছে নাকি? না অনুভব করতে পারছে না দেবীদাস: সারাদিন না খেয়ে থাকলে অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায় নাকি? কই শোনেনি ত—সেই যে কে যেন ৬৪ দিন না খেয়ে ছিল, জল পর্যন্ত ছুঁয়ে দেখেনি—আজ অন্তত বিশ্বাস করতে চায় না। তবু অনুপমা কাছে আছে, এই দুপুর রোদে অদ্ভুত লাগছে।

—কি খবর দেবীবাবু এখানে দাঁড়িয়ে? কি আশ্চর্য পাখীর স্বরের মতন মনে হচ্ছে কথাগুলো।

অনুপমা কি কথা কইছে নাকি? এবার ফিরে তাকায় দেবীদাসঃ এই মানে দাঁড়িয়ে আছি—কথা বলতে ও কষ্ট হয় যেন, কেমন খিঁচ ধরছে পেটে। তবু অনুপমা এত কাছে। চুলের গন্ধটা যেন পাওয়া যাচ্ছে।

—কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন নাকি?

অনুপমা কি হাসছে? কেমন যেন শিরশির করে কানের ভেতরটা। সত্যি কি কারো জন্যে অপেক্ষা করছে দেবীদাস? কই না ত। কিন্তু কি বলবে অনুপমাকে—চাকরী পায়নি আজ পর্যন্ত? কাল পর্যন্ত চলেছে কোনমতে, অন্তত ভাতের হাঁড়িতে জল ভরতে হয়েছে, আর তার গায়ে আগুনের আঁচ লেগেছে। কিন্তু আজ! মুটুবিহারী বাই লেনের একটা সংসারে আজ যে আর আঁচ পড়বে না সেটা জানে দেবীদাস। সকাল বেলাই কে যেন কাঁদছিল। যেন ভাঙা গলার বেসুরো সানায়ের পোঁ ধরার মতন কেমন যেন ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ। কানের ভেতরটা কেমন যেন করছিল—সহ্য করতে পারেনি দেবীদাস। ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। তখনও ভাল করে লোক চলাচল হয়নি। তারপর কত রাস্তা, রোড, লেন, বাই লেন, কত দেকানপাট অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরেছে দেবীদাস। কখন ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে আড়াইটেতে এসে ঠেকেছে খেয়ালই করেনি। অনুপমা কি কিছু বুঝতে পেরেছে? রোদ কি ছায়ায় গলে গেছে? না অনুপমার ভেজা চুলের হাওয়া গায়ে লাগছে? গাছের পাতার রং কি আশ্চর্য সবুজ? কিন্তু দোরে থেকে দোর কেন এ উঞ্ছবৃত্তি? আবার পেটটা কেমন যেন করছে। ক্ষিদে পেয়েছে। চিনেবাদামওয়ালাটা আসছে বুঝি। তবু অনুপমা পাশে। মাথার তেলের গন্ধ আসছে বুঝি বাতাসে।

—না, না, ঠিক কারো জন্যে নয়। এবার হাসতে চেষ্টা করে দেবীদাস। গালটা চড়চড় করছে। টান লাগছে চামড়ায়। তবু হাসে দেবীদাস। মনে হয় হাসি বুঝি ভাল করে ফোটে না। তবে ? সত্যি হাসছে বুঝি এবার ঃ তবে অভয় দিলে বলি। কোঁচার কাপড় দিয়ে মুখটা মুছে নিতে নিতে বলে দেবীদাস। না কোন ভয় নেই। বুঝতে পারে অনুপমা। না হলে এত হাসি হাসি মুখ। না, না, ওই ত কি যেন বলছে অনুপমা।

—নিশ্চয় অভয় দিচ্ছি—না বললে কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—কৃত্রিম কোপদৃষ্টিতে তাকায় অনুপমা।

ভারী ভাল লাগে দেবীদাসের ঃ আপনার জন্য। হয়ত সাহস করে বলে ফেলে দেবীদাস। অনুপমার দিকে তাকায়। রোদে কি লজ্জায় বোঝা গেল না গালদুটো টুকটুকে লাল।

—চলুন এগোনো যাক্। বলে অনুপমা কবিতা পড়ার মত অদ্ভুত স্বরে।

—এগোবো কতদূর ? আমায় আবার—বাধা দেয় দেবীদাস।

আর চলার ক্ষমতা নেই যেন। কেমন ভারী ভারী ঠেকছে পায়ের মাস্‌লগুলো।

—না, না, চলুন একটু। বেশীদূর না কার্জন পার্ক। কেমন আদুরে গলায় গলে গলে পড়ছে স্বর।

অসহ্য যন্ত্রণা মনে হতে লাগল দেবীদাসের। কে যেন একটা ভোঁতা করাত দিয়ে পায়ের মাস্‌লগুলো কুরিয়ে কুরিয়ে কাটছে। না তা নয় বোধ হয় ভেতরকার সূক্ষ্ম নার্ভগুলো পাকিয়ে একাকার হয়ে গেছে। কিংবা তা নয় বোধ হয় উই পোকার মত কিছু কুরে কুরে খাচ্ছে ভেতরটা। নিজেকে সংযত করে দেবীদাস। আর কত দূর। এখানে এত লোকজন কেন ? বেশ হত একটা ফাঁকা সরু রাস্তা পেলে। আর কতদূর ? দেবীদাস খোঁড়াচ্ছে। ডান পাটা

নাকি ঠিক মত পড়ছে না। একটা পা কি ছোট বড় হয়ে গেল নাকি। না এসব মনের ভুল। মাথার ভেতরটা যেন কেমন করছে। পানের দোকানের আয়নায় মুখটা দেখে নিতে পারলে কিন্তু বেশ হত। অনুপমা কি কিছু বলছে? কোন কথা কবিতার মত সুর করে। এখানে এত ঠাণ্ডা কেন? জ্বর আসেনি ত? ওই ত আরো একটু আরো একটু—মাঠের সবুজ ঘাস দেখা যাচ্ছে। সুপ্ত ক্ষিদেটা আবার যেন চাগিয়ে উঠল।

—অত জোরে জোরে হাটবেন না, আমায় যে রীতিমত দৌড়তে হচ্ছে!

—ও, একটু জোরে হাঁটছি বুঝি? আমার আবার ছোটবেলা থেকেই অভ্যেস। তাছাড়া মেয়েদের মত ঠিক ঠিক মেপে মেপে পা ত আর জীবনভর ফেলতে পারিনি। আমরা একটু বেহিসেবী চিরকাল।

তবুও হকারদের চালাগুলো ঘুরে ঘুরে কাপড় কিনতে হল অনুপমার জন্য। কিন্তু তখনো লক্ষ্যে পড়েনি অনুপমার। কিন্তু হঠাৎ মাঠে ফিরে যাবার সময় অবাক হয়ে বলল: একি, আপনি খোঁড়াচ্ছেন কেন? পায়ে কি হল?

—পায়ে? অবাক হয় দেবীদাস। সত্যি কি হল পায়ে? নিজের পায়ের দিকে তাকায় একবার। মনুমেণ্টটা দেখা যাচ্ছে বুঝি এখান থেকে? কত উচু ওটা? ওর ওপর থেকে সমস্ত কলকাতা দেখা যায় বুঝি? তা হবে। অনুপমা কি তাকিয়ে আছে এখনো? নিজেই কখন খোঁড়াতে সুরু করেছে—আপশোষ হতে থাকে, কেন আগে লক্ষ্য করেনি, তাহলে ত—। হাসিমুখে তাকায় ওর দিকে: না তেমন কিছু না। ব্যাপারটা কি—ট্রামে যায় পকেট মারা। মানে ব্যাগ শুদ্ধ তুলে নিয়েছে সমস্ত কিছু। তারপর আর কি এমনি পকেট। একটা পয়সা নেই। কণ্ডাক্টর পয়সা চাইবে—তার আগেই চলতি ট্রাম

থেকে নামতে গিয়ে—পাটা যেন কেমন, না তার জন্য বিশেষ কিছু—

—সে কি? অবাক হয় অনুপমা : আগে বলেননি কেন? আমি শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিলাম। আমি ভারি স্বার্থপর—কেমন কাঁদ কাঁদ শোনায় অনুপমার গলা।

রসিকতার লোভ ছাড়তে পারে না দেবীদাস : তার চেয়ে আরো বেশি কষ্ট হচ্ছে না খেতে পেয়ে। সেই সকালে বেরিয়েছি একেবারে কিছুই খাওয়া হয়নি। মনে মনে হাসে দেবীদাস। কেমন মোক্ষম চালটি মারা হয়েছে। দেবীদাসের অনুমান মিথ্যে হল না।

—তবে কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে এত বিরক্ত করলাম আরো করবো। সেই সকালে আমিও বেরিয়েছি এখন পর্যন্ত কিছুই খাওয়া হয়নি। চলুন একট চা খাওয়া যাক।

—চা? বলছেন যখন আপনারো প্রয়োজন, আমার নিজের জন্য অবশ্য বাড়ী গিয়েই চলত। ট্রাম ভাড়াটা কিন্তু আপনারই দিতে হবে তা বলে রাখছি--

শুধু চা নয় আনুষঙ্গিক কিছু জুটল দু'জনেরই। সমস্ত ক্লান্তি কাটিয়ে যেন নতুন জীবন পেল দেবীদাস। মাংসের হাড়গুলো চিবুতে চিবুতে ছোট ছোট ভাইগুলোর কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল বাবা, মায়ের কথা আর আইবুড়ো বোনটা যার কুমারী জীবনের মেয়াদ আর ফুরুচ্ছে না, তবু মন্দ লাগল না।

তারপর এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিল অনুপমা। একটা দেশলাই। আর চার আনা পয়সা ট্রাম ফেয়ার।

—এত যে ধার দিলেন আর যদি ফেরৎ না দিই। হাসল দেবীদাস

—আমি ত কাবুলিওয়ালা নই যে আপনাকে খুঁজে বার করবো। আর সবাই কি প্রত্যাশা নিয়ে দেয় দেবীবাবু। চোখের কোনাটা চিক্ চিক্ করছে না অন্য কিছু। আবার বলল অনুপমা : কিন্তু আপনার মনে রাখার মতন যথেষ্ট কিছু করতে পারিনি।

উত্তর দেয় না দেবীদাস।

—আপনার যে বীরত্ব আমরা দেখেছিলাম যে আত্মত্যাগ, আপনাকে ত মাথায় তুলে রাখা উচিত। আপনি যখন অনন্ত পোদ্দারকে মুখের ওপর জবাব—

এবার একটু আগ্রহ দেখায় দেবীদাস: আপনি ছিলেন নাকি তখন?

—বারে আমি ত আপনার রুমেই ছিলাম। এই ত সেদিনের কথা মনে নেই?

—মনে আছে।

—সেই যে আপনার কার যেন অসুখ হয়েছিল আর ওষুধের জন্য ব্ল্যাকের দাম চেয়েছিল। তারপর পুলিশের ভয় দেখিয়েছিলেন আপনি, খবর দেবেন বলেছিলেন—

আবার মনে পড়ে দেবীদাসের। অনন্ত পোদ্দারের মেদবহুল চেহারাটা ভেসে ওঠে। একেবারে কোলের ভাইটা ভুগছিল টাইফয়েডে। কি একটা ওষুধ যেন নতুন বেরিয়েছে। ভারী ধন্বন্তরী। ওরাই ছিল এজেন্ট। একটা কোর্স দেবার মতন চেয়েছিল দেবীদাস। সমস্ত কথা খুলেই বলেছিল, ছোট ভায়ের ভীষণ ব্যামার—বাঁচে না বোধ হয়। লক্ষপতি অনন্ত পোদ্দারের দয়াও হয়েছিল কথা শুনে। দশ টাকা দিয়েছিল ফল খেতে। কিন্তু ওষুধ? ওষুধের নাকি অনেক দাম, ওটা কি আর দু'এক টাকায় দেওয়া যায়? কিন্তু বাড়ী গিয়ে দেবীদাস দেখল ভাই মরে গেছে।

মনে নেই কিছু। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। একটা উন্মত্ত ক্রোধে পাগলের মত ছুটে গিয়েছিল। হাতে সেই বেশী টাকায় কেনা ওষুধ আর দশ টাকায় কেনা ফলের ঠোঙ্গা মুখের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, আর কি অসহ্য ঘৃণায় সারাটা শরীর কুচকে এসেছিল। কি ঘৃণ্য সরীসৃপের মত মনে হয়েছিল তাকে। অনন্ত

পোদ্দারের মুখের ওপর রেজিগনেশন লেটারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

ওখানে তখন ভীষণ হট্টগোল। চেয়ার ছেড়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সবাই। সমস্ত ক্লার্ক, একাউন্টটেন্ট, এমন কি টাইপিষ্ট অনুপমা সেও বুঝি এসে দাঁড়িয়েছিল অবাক চোখে। লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? অমন লোকটা শান্ত, ধীর। বাঁধা ধরা নিয়মে আসা যাওয়া করত ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। কাজে কমপ্লেন ছিল না। একাউন্টে গণ্ডগোল করেনি এক পয়সা কোনদিন। তবে অবাক চোখে এসে দাঁড়িয়েছিল সবাই।

আজ পার্কে বসে ঠাণ্ডা করে ভাবতে যেন কেমন লাগে। ভারী বিশ্রী মনে হয়। পাশে অনুপমা দূরে আকাশের শেষ প্রান্তে অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলো গাছে গাছে আর ঘরমুখো পাখীর দল, আরো কয়েক দল লোক—ভারী ভাল লাগে। একটু যেন লজ্জিত দেবদাস: আপনারা কিছূ মানে—সেদিনের জন্য আমাকে ভুল ভাবেন নি ত?

—না না। থামিয়ে দিয়ে বলে অনুপমা: আপনি ঠিকই করে ছিলেন আমরা সবাই মানে ষ্টাফের সবাই আপনার কথা ভালো ভাবে আলোচনা করেছি কতদিন। কি বলব আনন্দে আমাদের বুক ফুলে উঠেছে—

আবছা অন্ধকারে একবার তাকায় দেবীদাস অনুপমার দিকে। কেমন যেন উজ্বল দেখায় তার সারাটা মুখ।

অনুপমা আবার বলে: আমাদেরও কি সমস্ত অপমান গায়ে বাজে না। এক একবার ইচ্ছে করে দিই ছেড়েছুড়ে—

একটু হাসে দেবীদাস: সত্যি?

—হাঁা সত্যি। শুধু আমি নয়—সবাই। কিন্তু উপায় নেই। তিন চারটে প্রাণী চেয়ে আছে আমার দিকে! মাসান্তে যে কটা টাকা পাই তাতে কোন মতে চলে যায় খেয়ে না খেয়ে। আপনার

এই প্রতিবাদে আমাদের সকলেরই নীরব অংশ আছে।

এখন এই আবছা অন্ধকারে অনুপমাকে ভারী আপন বলে মনে হয় দেবীদাসের। আর কোন লজ্জা থাকে না দেবীদাসের মনে, থাকে না কোন সংকোচ। সকলেই ত তার দলে, তারই পাশাপাশি। এবার হেসে কথা বলে দেবীদাস : কিন্তু—এখন যে আর চলে না সংসার, প্রায় ছ'মাস বসে, যা কিছু ছিল ছোট ভাইটার চিকিৎসায় খরচা হয়ে গেছে। তাও ভাইটা মারা গেল আবার। মরেও গেল মেরেও গেল। হয়ত আবছা অন্ধকারে একটু কঠিন শোনায় দেবীদাসের গলা। হয়ত একটু নির্মম : তারপর বোঝেন ত অভাবের সংসার, রোগ যেন ছাড়তে চায় না। চাকরীও পাচ্ছি না। কি করে যে দিন চলছে—থামে দেবীদাস। কানের কাছে গমগম করতে থাকে তার নিজের কথাগুলো। কিন্তু কাকে সংকোচ করবে ? অনুপমাকে, সেও ত তারই দলে—একবেলা খায় আর একবেলা হয়ত না খেয়ে থাকে।

এরপরে আবার নুটুবিহারী বাই লেনে ফিরে যেতে হবে দেবীদাসকে। ফিরে যেতে হবে সেই দুঃখ দারিদ্র আর হাহাকারের মধ্যে। তবু জানে দেবীদাস, অন্যেরা তাকে স্বীকার করেছে। তাঁদের একজন বলে মেনে নিয়েছে।

অনেকক্ষণপর বলে অনুপমা : আপনার বাড়ী যাব একদিন—আগেও ভেবেছি অনেকদিন যাব—

—যাননি কেন ? গেলেই পারতেন।

—হ্যাঁ, যাব। অবশ্য দু'একজন গেছল এর আগে খবর পাননি ?

হ্যাঁ, খবর পেয়েছিল দেবীদাস। মা অবশ্য বলেছিলেন কারা যেন এসেছিল, তাকে খুঁজতে।

অনুপমা বলে : অনেক রাত হল এবার ওঠা যাক।

দু'জনে উঠে দাঁড়ায়।

ট্রাম রাস্তায় যেতে যেতে অনুপমা আবার বলে : ব্যবসা করুণ না।

—টাকা! টাকা কোথায় পাব ? বলে দেবীদাস।

—কেউ যদি দেয় ?

—আপনি দেবেন নাকি ?

—যদি দিই নেবেন না নাকি ?

—তা নেব না কেন কিন্তু এত লোক থাকতে আমাকেই বা দেবেন কেন ?

ট্রামে তুলে দেয় অনুপমাকে। তারপর আবার সেই নুটুবিহারী বাই লেনে ফিরে চলে দেবীদাস।

কত রাত হয়েছে কে জানে ? বাড়ীটা অসম্ভব নিস্তব্ধ। সবাই শুয়ে পড়েছে বোধহয়। দরজার কড়া নাড়তেই খুলে দেয় বোনটা। জিগ্যেস করে দেবীদাস : ভাত খেয়েছিস রুণু ?

মাথা নাড়ে রুণু : হ্যাঁ, খেয়েছি।

—কিন্তু মা চাল পেলেন কোথায় ? ফিস্‌ফিস্‌ করে জিগ্যেস করে দেবীদাস।

—পাশের বাড়ী থেকে ধার এনেছেন।

আর কিছু বলতে পারে না দেবীদাস। ছেঁড়া কাপড় জড়ানো রুণুর দিকে তাকাতেও পারে না ভাল করে।

রাতে ভাত খাওয়ার পরে কি ভাবছিল যেন দেবীদাস। মনে পড়ছিল মায়ের অসহায় মুখখানা বারবার। পাশের বাড়ী থেকে চাল ধার করে এনেছেন। সেই ভাতের থালা তুলে দিয়েছেন দেবীদাসের সামনে। সে নীরব দৃষ্টিতে কি লজ্জা ছিল বুঝেছে দেবীদাস—এমন সময় রুণু এল পা টিপে টিপে : দাদা ?

—কে ? চমকে তাকাল দেবীদাস : রুণু এত রাতে কি চাই।

কিছু উত্তর দিতে পারে না রুণু চট করে। অনেকক্ষণ

দাঁড়িয়ে থেকে বলে: আজকাল ত মেয়েরা চাকরী করছে দাদা, পাড়ার অনেকেই—

অবাক চোখে তাকায় দেবীদাস।

—সেটা ত আর খারাপ নয়—আমাকে একটা চাকরী জোগাড় করে দাও না?

—আচ্ছা পরে দেখা যাবে। আজ যাও এখন। আচ্ছা শিবু ফিরেছে। শিবদাস?

মাথা নাড়ে রুণু: হ্যাঁ, এই ত ফিরেছে। মেজদা কোথায় যেন কিসের কাজ জোগাড় করেছে একটা কারখানায়।

কথা বলে না দেবীদাস।

আবার বলে রুণু: আজকেই কি কালী-ঝুলি মেখে এয়েছে মা বললেন খেয়ে শুয়ে পড়তে কিন্তু আবার বই নিয়ে বসেছে—

—আমার ভারী ঘুম পাচ্ছে। এখন যা। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল দেবীদাসের, এবার শুয়ে পড়ল।

তারপর আবার সেই গতানুগতিক দিনক্ষয়।

মায়ের করুণ মুখ নির্বিকার, বাবার অসন্তোষ, ভাইদের হাহাকার। আর প্রত্যেক দিনের মত অপিস পাড়ায় টহল দেওয়া, এক তলা থেকে পাঁচ তলা। প্রত্যেক অপিসে কর্মখালির খোঁজ নেওয়া—

তবু একদিন সকালে বাইরে বেরুচ্ছিল দেবীদাস—আর অনুপমা এসে হাজির। অবাক দেবীদাস: কি ব্যাপার এত সকালে যে?

—কিছু না এমনি এলাম বেড়াতে। বলেছিলাম, আসব।

—তা বেশ করেছেন।

—আপনার মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন—

মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল অনুপমা।

আশীর্বাদ করলেন মা: বেঁচে থাক মা, কিন্তু চিনতে পারলাম না ত—

—আমি যে অফিসে কাজ করি সেখানে কাজ করতেন। অনুপমার কাছে চাকরী ছাড়ার গল্প শুনলেন মা। সমস্ত কথাই বলল। আজকাল কেমন খাতির করে সবাই কেমন শ্রদ্ধা করে।

মা, রুণু, শিবদাস সবাই শোনে অবাক হয়ে। অদ্ভুত লাগে দেবীদাসকে তেজী ঘোড়ার মতন সোজা ঘাড়।

দেবীদাস বলে : জান অনুপমা, শিবু চাকরী পেয়েছে। এখন কিছুটা সংসারও চালাচ্ছে।

সত্যি ? কি করছে। কোন অফিসে ? মা কি ভাবেন কে জানে। বলেন : সে এক সাহেবের অফিসে—হ্যাঁ, ভারী ভালবাসে সাহেব ওকে।

এবার হাসে দেবীদাস।

শিবদাস বলে : না, না। মা জানেন না—একটা কারখানায় কাজ নিয়েছি।

—বেশ ভাল ; আরো ভাল করে পাশ করা চাই কিন্তু।

মা লজ্জা পান। উস্‌খুস্‌ করেন উঠে যাবার জন্য।

অনুপমা বলে : জানেন মা আমার ভাই নিজের রোজগারে পড়ছে। জুতোর দোকানে পার্ট টাইম কাজ করে। আমি ত আর ওকে পড়াতে পারছি না।

মা উঠে যান।

কিছু টাকা বার করে দেয় অনুপমা : এটা রাখুন—অফিসের কর্মচারীরা এটা দিয়েছে যেদিন ইচ্ছে ফেরৎ দিলে চলবে। এই কাগজটায় লেখা আছে সকলের নাম আর টাকার অঙ্কটা—

হাত পেতে নেয় দেবীদাস। একে একে সকলের নাম পড়ে। তারপর হেসে বলে : একজনের নাম যেন বাদ পড়ে গেছে। তার কাছ থেকে কিছু পাব ভেবেছিলাম।

হাসে অনুপমা। রাঙা হয়ে ওঠে গালটা।

শিবদাস বেরিয়ে আসে আস্তে আস্তে।

—তার নামে এটা জমা করে নিন। নতুন হাল্‌কার ওপর একটা সুন্দর ডিজাইনের আংটি বার করে দেয় অনুপমা।

অনুপমার আঙুলের দিকে তাকায় দেবীদাস। অনামিকায় একটা সাদা দাগ দারুণ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

রমলা এসেছিল।

আবার।

হাতে সেই ক্যানভাসের কিডব্যাগ।

সেদিনের মত আজও।

— নমস্কার।

ফিরে তাকাল সুলতা। দেখল ভাল করে। হাত জোড় করে অপেক্ষা করছে অচেনা একটি মেয়ে তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কি চায়?

—নমস্কার। বলল সুলতাও।

কেটে গেল কয়েকটা অবাক মুহূর্ত। অবাক প্রহর গোনা শেষ হোলো বুঝি এতক্ষণে।

ভাষার সাগরে কথার নোঙর ফেলল মেয়েটি। হাতের ব্যাগটা ধপ্ করে মাটিতে ফেলে এক টানে চেনটা খুলে ফেলল। ফ্যাস্—স্—স্—করে আওয়াজ হোলো শুধু। তারপর ব্যাগটা ফাঁক করে বার করতে লাগল কয়েকটা টুকিটাকি জিনিসের সংগ্রহ। আলতার শিশি, স্নো'র ফাইল, পাউডারের কৌটো। আরও কত কি যেন: আপনার জন্য এনেছি। বলতে লাগল মেয়েটি।

সুলতা তখনও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে মেয়েটিকে।

ক্লান্তির ঘাম ঝরছে মেয়েটার মুখ দিয়ে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে বড় ক্লান্ত। কেউই কিছু কিনছে না। তা হলে—তা হলে কি যে হবে। —আর চিন্তা করতে পারছে না। মনটা শিউরে শিউরে উঠছে শুধু।

তবু সুলতাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবার সে বলতে চেষ্টা করল : আপনাদের জন্য এনেছি দিদি, সব জিনিস আমাদের কেমিক্যালের। নিজেরাই তৈরি করে থাকি সতীলক্ষ্মী তরল আলতা—খুব একটা ভাল আলতা। পায়ের হাজা ফাটা সব নষ্ট করে। সুরভি স্নো—মুখের রুক্ষতাকে নষ্ট করে মসৃণতাকে ফিরিয়ে আনে। মুখের কোনরকম দাগ আর থাকে না। গরমের সময়ে ঘামাচিতে আপনারা সবাই কষ্ট পেয়ে থাকেন। আমাদের এই চম্পা পাউডার একবার লাগালে আর দু'বার লাগাতে হয় না ঘামাচি-টামাচি সব একেবারে শেষ।

সুলতা একসময়ে বলেছিল : আলতার দাম কত আপনাদের ?

—আমাকে আবার আপনি কেন দিদি ? আমার নাম রমলা। আর আলতার দামের কথা বলছেন ? আট আনা শিশি।

—আট আ—না—!

চমকে উঠল রমলা। ওরে, এখানেও কি কিছু হোলো না ? বলতে চেষ্টা করল সে : আপনারা না কিনলে, আমরা পাব কি দিদি ? আপনাদের পাঁচজনের ভাবনায় ত বেরিয়েছি। কান্নায় স্বর বুঝি বুঁজে আসতে চাইল রমলার।

—তা হলে এক শিশি আলতা দেব, দিদি ?

দিদি ! ডাকটা কত মধুর। সুলতাকে দিদি বলে কেউ তো ডাকে না। ভাই-বোন বলতে কেউ নেই সুলতার। সুলতা একা। তাই এত ভাল লাগল এই দিদি ডাক। ভাল লাগে রমলাকে। তাই তো বলে বসল : এক শিশি আলতা দাও, রমলা।

—আঃ, বাঁচালেন দিদি। আর কিছু দেব না ?

এই কতক্ষণের আলাপে কত আপনার হয়ে উঠেছে রমলা। আহা কত কষ্ট ওদের। এই জিনিস বিক্রী হবে, তবে ওদের খাওয়া জুটবে—দু'মুঠো ভাত। এবার যেন সুলতা বলতে চেষ্টা করল : তোমার কাছে যা যা আছে, আমাকে দিতে পার রমলা।

রমলা তাকাল স্থলতার দিকে। দু'চোখে শুধু কৃতজ্ঞতা।

তারপর ওদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হোলো।

স্থলতা বলেছিল : তোমার আর কে কে আছে, রমলা ?

—বুড়ো বাবা, নাবালক ভাই।

—তোমার বিয়ে হয়নি বুঝি ? স্থলতা এখন অনেক অন্তরঙ্গ।

—না। বিয়ের সব ঠিক—মাসখানেক বাদে দিন ছিল। কিন্তু তারপর কি যে হয়ে গেল। ঢাকার বিক্রমপুরে ছিল দেশ। দেশ ভাগাভাগি হোলো—। থামল রমলা। কাঁদছে বুঝি !

—তারপর ? অধৈর্য স্থলতা।

দুঃখের পাঁচালীর পাতা ওল্টাতে লাগল রমলা একটা একটা করে : তারপর কে যে কোথায় ছিট্‌কে গেল—এলাম এ শহরে। ফুরিয়ে গেল, যা নিয়ে এসেছিলাম সঙ্গে করে। এখন উপায় ? কি করে সংসার চলবে ? তারপর—তারপর এই চাকরী নিলাম। এখন আপনাদের ভরসায় বেঁচে আছি দিদি। কিন্তু তাকে আর খুঁজে পেলাম না। ভরসা দিয়ে কোথায় যে চলে গেল—।

রাত্তিরের পাট চুকিয়ে স্থলতা ঘরে এল। হাতে একগ্লাস জল আর কয়েক খিলি পান।

ননীমাধব তখনও ঘুমোয়নি। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে আর স্থলতার অপেক্ষা করছে।

—আজকে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। কোন রকম ভূমিকা না করেই কথাগুলো বলল স্থলতা।

—মানে ? ননীমাধব ফিরে তাকাল। গল্পের বই বন্ধ করে চোখ রাখল স্থলতার চোখে। আর চুড়ির জলতরঙ্গ বাজনা শুনল।

—আলতা-স্নো বিক্রী করবার জন্য একটা মেয়ে এসেছিল আজ।

—কিছু গছিয়ে গেল তো ? সিধে হয়ে বসেছে ননীমাধব।

চুড়ির জলতরঙ্গ বাজনা তখন থেমে গেছে।

এগিয়ে এল স্থলতা। জলের গ্লাস এগিয়ে দিতে দিতে বলল, কি যে কথার ছিরি তোমার।

রাগ করল ননীমাধব : অত কথা শুনতে চাই না। জিনিস কিছু বিক্রী করে গেছে কিনা, তাই জানতে চাই?

—হ্যাঁ। জলের গ্লাস হাতে নিয়ে তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে স্থলতা।

—খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। তবুও দু'মুঠো ভাল করে খেতে পারি না—ভাল জামা-কাপড় পরা তো দূরের কথা। আর উনি দাতব্য শুরু করেছেন। বোকা স্ত্রী নিয়ে যত ঝামেলা হয়েছে আমার। যত ঠগ বেরিয়েছে আজকাল। ঠকাতে পারলে আর ছাড়বে না। যত বাজে মেয়ে—যত সব।

স্থলতা রাগল না মোটেই। কোন ভাবান্তর নেই কথার সুরে: রমলাকে এ দোষ দিতে তুমি পারবে না, এ আমি বেশ বলতে পারি।

—রমলা! চমকে উঠল ননীমাধব। একি সেই রমলা? যাকে একদিন স্থলতার জায়গায় জীবনে স্থান দেবে ঠিক করেছিল, সেই রমলা আলতা বিক্রী করছে ঘুরে ঘুরে? তা হবে। এর চেয়ে কত খারাপ কাজ করতে দেখেছে ননীমাধব কত মেয়েকে। তার চেয়ে এ ভাল—ভাল। এ তো সামান্য কাজ আলতা ফেরি করা। রমলার কি বিয়ে হয়েছে?

—কি যেন বললে নামটা? ননীমাধব যেন অনেকটা সহজ হতে পেরেছে এতক্ষণে।

—রমলা। স্থলতার চোখে-মুখে কৌতূহল : চেনো নাকি ওকে?

—কই, না তো। কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাল ননীমাধবকে।

ননীমাধব চিনত বটে এক রমলাকে। ঢাকার বিক্রমপুরে তার দেশ। মামার বাড়ীর দেশে তার দেশ। সে-ই কি এসেছিল আলতা ফেরি করতে তাদের বাড়ী ? সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে ননীমাধবের। চোখের সামনে শুধু ছুটো চোখ ভাসছে। কেমন জ্বলজ্বলে ছুটো কালো চোখ। অদ্ভুত কালো আর সুন্দর। যে চোখের মায়ায় পাগল ননীমাধব। অসুখের সময়ে এই চোখ ছুটোকে শিয়রে জেগে থাকতে দেখেছে। প্রত্যেক দিন ননীমাধব জিগ্যেস করেছ : কে তুমি ?

পালিয়ে গেছে মেয়েটি।

মামীমা একদিন বললেন, ও আমাদের রমলা। পাশের বাড়ির বোসেদের মেয়ে। বেশ মেয়েটি। তোর অসুখের সময়ে কি খাটুনিটা না খাটল। আমাদের কিছুই করতে দিল না। ও একাই সব করল। বললে বলত : 'তোমাদের কিছু করতে হবে না খুড়ীমা, আমি একাই পারব। তা দেখাল বটে।

ননীমাধব চুপচাপ শুনতে লাগল কথাগুলো।

মামীমা আবার বললেন, তোদের চারটে হাত যদি এক করে দিতে পারতাম।

মামীমার স্বপ্ন ছিল অনেক।

স্বপ্ন ননীমাধবও দেখেছিল। কালো চোখের মায়া ননীমাধবকে পাগল করে রেখেছিল।

রমলা—সুলতা—।

—কি গো, অমন হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ ?

—কই, কিছু না। মুখটা ঘুরিয়ে নিল ননীমাধব। কালো চোখের মায়া তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ননীমাধব বলল,

এবারে এলে কথায় কথায় রমলার ঠিকানাটা রেখে দেবে। আলতা-স্নো যা দরকার হবে, সব ওরই কাছ থেকে নেবে।

সুলতা অবাক চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

রমলা এসেছিল।

আবার।

হাতে সেই ক্যানভাসের কিড ব্যাগ।

—দিদি গেলেন কোথায়?

—কে? সুলতা নেমে এল নিচে। ওঃ, রমলা এসেছ। উচ্ছ্বসিত সুলতা।

—হ্যাঁ দিদি, আপনাকে কোনদিন আমি ভুলতে পারব না।

কথায় কথায় সুলতা এক সময়ে বলেছিল, আচ্ছা রমলা, তোমার ঠিকানাটা সেদিন নিতে ভুলে গেছলাম।

যদিও জানে সুলতা রমলার ঠিকানা তার কোনদিন দরকার লাগবে না। তবুও জিগ্যেস করে বসল। ননীমাধব কেন যে রমলার ঠিকানা চেয়েছিল?

—কেন দিদি? আমি তো প্রায়ই আসব। আবার ঠিকানা দিয়ে কি হবে?

—তবুও তোমার ঠিকানা আমার কাছে রেখে যাও। কখন কোন্ জিনিসটা দরকার হবে বলা তো যায় না—তখন না হয় চিঠি দিয়ে তোমাকে জানিয়ে দিতে পারব।

বাঃ, ঠিক বলেছেন। শেয়ালদার ওদিকে বুদ্ধু ওস্তাগর লেনে আমারা থাকি।

শেয়ালদায় এসেছিল ননীমাধব। রোজই আসতে হয়—তাকে আজকেও এসেছিল।

তখনও সন্ধ্যা নামেনি ভাল করে। জ্বলেনি রাস্তার বাতিগুলো। শুধু অফিস-ফেরা লোকদের বাড়ি ফেরার তাগিদ স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমেই। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে-থাকা ট্রেনে হুড়োহুড়ি করে ওঠার কমতি নেই এতটুকু। দেরী করার উপায় নেই—ট্রেন ছেড়ে গেল। আবার ঘণ্টাখানেক বাদে ট্রেন। তাতেও সেই হুড়োহুড়ি—ঠেলাঠেলি। আর ট্রাম-বাসগুলোর জট পাকানো অবস্থা শেয়ালদা আর মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে। ট্রাফিক পুলিশের প্রাণান্তকর চেষ্টা—এই জট তাকে খুলতে হবে।

হাসি পায় ননীমাধবের। মহাত্মা গান্ধী রোডের সামনে এসে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। ভালই হয়েছে। বেঁচে গেছে ননীমাধব। চাকরী থাকলে তাকেও ওই ঠেলাঠেলির দলে গিয়ে মিশতে হত। ওদের ওই বাড়াবাড়ি ননীমাধবের মনে ঘেন্না ধরায় যেন। হয়ত চাকরী না-পাওয়ার দরুণ ননীমাধবের মনের এ একরকম বিক্ষোভ।

চাকরীর চেষ্টা ননীমাধব অনেক করেছে। অফিসে-অফিসে ঘুরেছে। সবাই নো-ভ্যাকান্সির সাইন-বোর্ড দেখিয়ে বড় রাস্তার সিধে পথটা দেখাতে চেষ্টা করেছে। এক জায়গায় চাকরী হতে হতে ফসকে গেল। ইণ্টারভ্যু পর্যন্ত হয়ে গেল। পাশও করল ননীমাধব। কিন্তু ডাক আর আসে না। তারপর অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, বড়বাবুর শালা না ভাগ্নে, কে যেন কাজে লেগে গেছে। ওদিকে পুঁজি ফুরিয়ে আসছে। যা হোক কিছু একটা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত ক্যাম্বেল হাসপাতালের কাছে হকার্স-কর্ণারে জামা-কাপড়ের একটা দোকান দিয়ে বসল।

আলো জ্বলে উঠল। অফিস-ফেরৎ লোকদের চঞ্চলতা স্থির হয়ে অসেছে। ট্রাম-বাস-মটোরের জট খুলে গেছে। হাঁফ ছাড়ছে যেন ট্রাফিক পুলিশ।

রমলা—!

রমলা এই শেয়ালদার দিকে কোথায় থাকে যেন। ভাবতে চেষ্টা করল ননীমাধব। স্থলতা বেশ কায়দা করেই রমলার ঠিকানাটা জেনে নিয়েছে। হাসল ননীমাধব। কিন্তু স্থলতাকে বুদ্ধিটা ননীমাধবই দিয়েছিল। সেটা কি বুঝতে পেরেছে রমলা? আর স্থলতা? 'তুমি কি চেনো নাকি রমলাকে?' স্থলতা জিগ্যেস করেছিল সেদিন। বড্ড জোর বেঁচে গেছে ননীমাধব। বলেছিল অবাক হয়েঃ কই, না তো! স্থলতা আর বলেনি কিছু। উঃ! কি বোকা এই স্থলতা।

মির্জাপুর ছাড়িয়ে কখন যে এগিয়ে গেল ননীমাধব। আর একটু গেলেই বুদ্ধু ওস্তাগর লেন। তারপর—তারপর।

কখন যে ননীমাধব ঢুকে পড়ল বুদ্ধু ওস্তাগর লেনে, আর কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে থাকল রাস্তায়। ধোঁয়া—চারদিকে কেবল অসহ্য ধোঁয়া। দম বন্ধ হয়ে আসবে না কি ননীমাধবের? লাইন দিয়ে উনুনে আঁচ লাগিয়েছে। আঠা না কি যেন তৈরি করছে কেউ কেউ। দপ্তরী-পাড়ায় বাড়ি নিয়েছে রমলারা।

সারি বাঁধা বই বাঁধাইয়ের দোকানের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল ননীমাধব। বাঁধা হ'য়ে দাঁড়াল যত রাজ্যের ধোঁয়া। তখন ননীমাধব জিগ্যেস করেছিল একজনকেঃ নম্বর বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

—এগিয়ে যান, ডান দিকে একটা সরু গলি পাবেন। কিছু দূর এগোলেই গলিটা বাঁক নেবে। সেখানেই—

কয়েক পা চললেই তবে গলিটা। ওই গলিতেই তবে রমলারা থাকে। অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছে। তবে এখানেও—।

অন্ধকারে হাঁটু ডুবিয়ে ডুবিয়ে এগিয়ে চলল ননীমাধব। রমলা—। গান গেয়ে উঠল মন। সুর—সুরের মূর্ছনা। ঢেউয়ে উতলা করে তুলল ননীমাধবকে।

হাতড়াতে হাতড়াতে কখন যে ননীমাধব এসে পৌঁছল নির্ধারিত বাড়ির সামনে। কড়া দুটো নাড়া দিল। একবার দাঁড়িয়ে থাকে ননীমাধব।

—কে ? কর্কশ মেয়েলি চীৎকার।

চমক ভাঙল ননীমাধবের : রমলা নামে কেউ কি থাকে এখানে ?

—হ্যাঁ।

উৎসাহিত ননীমাধব।

—কিন্তু এখন ও নেই। কোথায় যেন বেরিয়েছে। ওর স্বামী আছে। ওই ওদিককার ঘরেতে ওরা থাকে।

স্বামী ! রমলার স্বামী ! তা হলে বিয়ে করেছে রমলা ?

অথচ—

—এদিক দিয়ে সোজা চলে যাও। কর্কশ চীৎকার এখনও শুনতে পাচ্ছে ননীমাধব।

গান থেমে গেছে। সুর আর নেই—ফুরিয়ে গেছে।

তবে রমলা যে বলেছিল, ওর বিয়ে হয়নি ? তবে ? সবই তা হলে ভুল। রমলা তা হলে ঠকিয়েছে। কেমন যেন গুলিয়ে যেতে লাগল ননীমাধবের।

ননীমাধব আবার ঝাঁপ দিল আঁধার সমুদ্রে। সামনের আলোর রাজ্য তখনও দূরে।

তারপর সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল।

বাস ধরবে বলে রমলা বুঝি অপেক্ষা করছিল ষ্ট্যাণ্ডে। হাতে সেই ক্যানভাসের কিড ব্যাগ। প্রসাধনের টুকিটাকিতে ঠাসা।

ননীমাধব দেখল। চিনতে পারল রমলাকে। একটুও বদলায়নি রমলা। তবে একটু রোগা লাগছে। তাই বুঝি লম্বাও দেখাচ্ছে।

ননীমাধব এপাশে এল। দাঁড়াল রমলার মুখোমুখি: রমলা! ডাকতে চেষ্টা করল ননীমাধব।

হাসল রমলা: কে, ননীদা না?

—চিনতে তা হলে পেরেছ। হাসল ননীমাধবও।

—আমার চোখ কি এতই খারাপ্ হয়ে গেছে যে, চেনা মানুষকে চিনতে ভুল হবে? ভারী কিড ব্যাগটা সামলাতে সামলাতে রমলা বলল, চলো, একটু চা খেয়ে আসি। ভেবেছিবাম, জীবনে বুঝি আর দেখা-ই হোলো না। হাসছে রমলা সুর করে।

—কিন্তু কোথায় যেন যাচ্ছিলে না? বলতে চেষ্টা করে ননী-মাধব। রমলার দেওয়া আঘাত সহজে হজম করে আরও সহজ হতে চেষ্টা করে ননীমাধব: তাই চলো, এক পেয়ালা চা-ই খাওয়া যাক।

চা খেতে খেতে অনেক কথাই হোলো ওদের মধ্যে।

রমলা বলেছিল: শেষ পর্যন্ত পারফিউমারীর ক্যানভাসিংয়ের চাকরীটা নিলাম। এই দেখছ না—। ভারী কিড ব্যাগটা দেখাল রমলা।

—জানতাম।

অবাক হোলো রমলা। কিন্তু মুখে কোন ভাব না দেখিয়ে বলেছিল: তুমি এখন কি করছ, ননীদা?

—চাকরীর অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোথায় চাকরী? টাকা-পয়সাও শেষ হয়ে আসতে থাকে। শেষে উপায়ন্তর না দেখে হকার্স কর্ণারে জামা-কাপড়ের দোকান দিয়েছি—

ননীমাধবকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রমলা বলেছিল: তারপর তুমি বিয়ে করেছ, ননীদা?

খানিকক্ষণে চুপ করে থেকে উত্তর দেয় ননীমাধব: হ্যাঁ। কেমন ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ বেরোয় ননীমাধবের গলা চিরে: আর তুমি?

—নিশ্চয় করেছি। কেমন উজ্জ্বল দেখায় রমলাকে: বয়েস হয়েছে, বিয়ে করব না? কেমন এক আক্রোশে ফেটে পড়ল রমলা: আর কোন্ মেয়ের বাপ-মা চায় না, তার মেয়ের বিয়ে হোক? তাই আমারও বিয়ে হোলো। হঠাৎ যেন নিভে গেল রমলা: দেশ ভাগ হয়ে গেল, তুমি কোথায় চলে গেলে। তাই বাবা-মা তাড়াতাড়ি এক রকম জোর করেই মেয়ের বিয়ে দিলেন।

ননীমাধব তাকিয়ে আছে রমলার দিকে: তুমি নিশ্চয় সুখী হয়েছ, রমলা?

—তা বলতে; খুব সুখ আমার। চলো নিজের চোখে দেখে আসবে, কেমন সুখে আছি আমি।

শেষ পর্যন্ত ননীমাধবকে একরকম জোর করেই নিয়ে এল রমলা।

বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল ননীমাধব: না, থাক আজ। বরং অন্যদিন—।

—না-না, আজকেই যেতে হবে। কোন বাধাই মানব না আমি।

রমলার সাড়া পেয়ে বুড়োটে গলায় কে যেন বলে উঠল: কাকে নিয়ে এলে, রমলা?

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে রমলা ননীমাধবকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল: বসো এখানে, আমি আসছি।

পাশের ঘর থেকে তখনও সমানে সেই বুড়োটে গলার চীৎকার শোনা যাচ্ছে: কার সঙ্গে কথা বলছ, রমলা?

একটু বাদেই রমলা এল আটপৌরে শাড়িখানা কোন রকমে গায়ে জড়িয়ে।

ওদিকে বুড়োটে গলার চীৎকার ক্রমেই চরমে উঠতে শুরু করেছে: আমার কথা কানে যাচ্ছে না? কার সঙ্গে কথা বলছিস্?

এবারে যা করল রমলা, তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না ননী-মাধব।

রমলা খপ্ করে ননীমাধবের একটা হাত ধরে বলল, দেখবে এসো, কেমন সুখে আছি আমি।

ননীমাধবকে টেনে নিয়ে এল রমলা পাশের ঘরে। তক্তপোষের ওপরে লেপ্টে-থাকা একটা নর-কঙ্কালের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, ওই আমার স্বামী।

কেমন যেন চমকে উঠল ননীমাধব। ওই রমলার স্বামী? মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে যেন দিন গুনছে লোকটা।

—কেন—কেন তুমি আমার এ ক্ষতি করলে? কেন তুমি পালিয়ে এলে? ননীমাধবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদছে রমলা।

শক্ত করে হাত দুটো না ধরলেও মুঠি ছাড়াতে পারল না ননী-মাধব।

অবশ্য অমিয়কান্তি ভেবেছিল চমকে উঠবে সুলতা হঠাৎ সেলাই কলটা দেখে। সেই জন্যেই আগে থেকে কাউকে কিছু জানায়নি সে। ইচ্ছে ছিল হঠাৎ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চমকে দেবে সকলকে, বিশেষ করে সুলতাকে—

কাগজের মোড়কটা ওপর থেকে দেখে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি সুলতা। ছুটে এসে খুলতে গেছল কাগজের মোড়কটা কিন্তু—

হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেলেছিল অমিয়কান্তি: উঁহু আগে বলত কি আছে এতে?

ঠোঁট ফুলিয়ে বলল সুলতা: বারে, আমি কি করে বলব? আমি ত আর আনিনি—

হেসে বলল অমিয়কান্তি: তা ত আমি জানি, সেই জন্যেই জিগ্যেস করছি—

—না আমি জানি না খোলো—আদুরে মেয়ের মত ঘন হয়ে এল সুলতা: খোলো, আহা খোলোইনা বাপু—বলে তার অপেক্ষা না করে নিজেই খুলতে লেগে গেল।

স্ত্রীর দিকে হাসি মুখে চেয়ে রইল অমিয়াস্তি। প্যাকিংটা খোলা হল। ভেবেছিল আনন্দে খুসীতে উচ্ছল হয়ে উঠবে সুলতা।

কিন্তু ঠোঁট উলটে বলল সুলতা: ও এই—আমি ভেবেছিলাম না জানি কি—বলে উঠে দাঁড়াল।

আহত হল অমিয়কান্তি সুলতার এই নিস্পৃহতায়। শুধু বলল: পছন্দ হয়নি বুঝি? তুমি কি ভেবেছিলে বলত?

তেমনি সুরে আবার বলল সুলতা: ভেবেছিলাম রেডিও-টেডিও, আজকাল ত সকলের বাড়ীতেই থাকে। তা ছাড়া আমি ত তোমাকে বলেছিলাম কতদিন, তোমার কি সে সব কথা আর মনে আছে?

হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না অমিয়কান্তি। নিশ্বাস ফেলে বলল: মনে আছে, সুলু ভুলিনি! থাক তবে তোমার যখন পছন্দ নয়—বলে নিজেই আবার কাগজে মুড়ে রাখতে লাগল।

অমিয়কান্তির দিকে না তাকিয়েই বলল সুলতা: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ও ফেরৎই নিয়ে যাও। শুধু শুধু কতগুলো টাকা নষ্ট আর কি—

কোন কথার উত্তর দিল না অমিয়কান্তি। নিঃশব্দে কাজ করতে লাগল। তারপর এক সময়ে বলল: ভেবেছিলাম তুমি ত একটু আধটু সেলাই করতে পারবে তাই—

—না বাবা সে আমি পারব না? একে আমার চোখের অসুখ তা ত তুমি জানোই। তার ওপর তোমার সেলাই করতে গেলে, চোখের কি আর কিছু থাকবে?

স্ত্রীর দিকে একবার বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, পরে নিরীহ গলায় বলল অমিয়কান্তি: তবে থাক—

টেবিলের ওপর তুলে রাখছিল সেলাইয়ের কলটা, আহ্নিক সেরে শৈলবালা এলেন, বলেন: কি এনেছিস রে?

হেসে বলল অমিয়কান্তি: কই কিছু না ত—

বিস্মিত হয়ে শৈলবালা বললেন: সে কিরে—আমি যে ঠাকুর ঘর থেকে সব শুনলাম—

কপট গাম্ভীর্যে বলল অমিয়কান্তি: সে কি মা, তুমি ত জপ করছিলে কিন্তু শুনলে কি করে?

সস্নেহে বললেন শৈলবালা: তোদের জ্বালায় কি আর তার জো আছে, পরকালের ভাবনা তোরাই ভুলিয়েছিস যে—

ভারী অদ্ভুত লাগল কথাগুলো ওদের। একে চাপা মানুষ শৈলবালা। চট করে বেশী কথা বলেন না। তার ওপর সর্বক্ষণ কাজ-কর্মে ব্যস্ত। রান্নার জোগাড় দেওয়া, বাজারে লোক পাঠানো—অমিয়কান্তি রোজ রোজ যেতে পারে না, যেতে চায়ও না। নীচের ফ্লাটের বিশুকে দু'চার আনা পয়সা ঘুষ দিয়ে বশ করে তবেই না—

দুপুর বেলা রামায়ণটা খুলে বসেছেন শৈলবালা। খাওয়ার পরে অলস তন্দ্রায় স্নায়ু শিথিল। জানালা দিয়ে এসে পড়েছে খানিকটা হলদে রোদ। ছায়া পড়েছে জানালার ওপর লুটিয়ে পড়া জামরুল গাছটার, নীলছে ভারী ভারী ডাগর পাতার—

বারান্দায় কুণ্ঠিত পায়ের শব্দ শোনা যায়। চশমাটা খুলে আঁচল দিয়ে মুছে চোখে তোলেন আবার আলস্যের হাই তুলতে তুলতে। পায়ের শব্দ এসে দাঁড়ায় দোর গোড়ায়। প্রতীক্ষা করেন শৈলবালা কিছুক্ষণ, চুপচাপ, নিঃশব্দে—পরে নিজেই ডাকেন: কে বিশু নাকি? এস ভাই ভেতরে এস—

ঘরে ঢুকে একটা নিঃশব্দ সরল হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে বিশু বলে: আপনি এখনো ঘুমোন নি ঠাকুমা, বলতে বলতে কাছে, পায়ের কাছে এসে বসে—

—কি আর করব ভাই, বইটা নিয়ে বসেছিলাম একটু। তন্দ্রা এসেছে তাই আর কি—তোমার খবর কি, দুপুরে শোওনি যে আজ?

—না। ভাল লাগল না ঠাকুমা, তাই পালিয়ে এলাম। আজ তোমার কাছে শোব কেমন?

—আচ্ছা হবে এখন—আমাকে একটু পড়তে দে দেখি, বলে রামায়ণখানা টেনে নিলেন চোখের সামনে। গুন্ গুন্ সুরে পড়তে

স্থরু করলেন। সীতার পাতাল প্রবেশ। পড়তে পড়তে আবেশের ঘোরে চোখের কোণায় জল জমে উঠেছিল কখন। রাজনন্দিনী সীতার দুঃখের করুণ অধ্যায় বিচলিত করে তোলে আজও শৈলবালাকে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ফিরে দেখেন বিশু অন্যমনস্ক হয়ে জানালার দিকে চেয়ে। দূরে আকাশে কটা চিল চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন শৈলবালা। মনে হয় আগের থেকে অনেক যেন রোগা হয়ে গেছে বিশু। ঘাড়ের দাঁড়া দু'টো অনেক সরু আর রোগাটে দেখাচ্ছে যেন—হয়ত কোনদিন মাথাটার ভার আর যেন সইতে না পেরে মট্ করে ভেঙে পড়বে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকে থেকে বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল শৈলবালার। কান্নার মতন কি যেন একটা ঠেলে ঠেলে আসতে চাইল বুকের কাছটায়। ডাকলেন শৈলবালাঃ হ্যাঁরে, বিশু এদিকে শোন ত কাছে আয়—

—কি ঠাকুমা? ধ্যান ভেঙে জেগে উঠল বিশু। তারপর শৈল-বালার কোল ঘেঁসে দাঁড়াল।

—আজকে কি দিয়ে ভাত খেয়েছিস রে?

—ডাল দিয়ে, মাছ দিয়ে, বলল বিশু। তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলঃ হ্যাঁ ঠাকুমা তুমি কি দিয়ে খেয়েছ?

—কেন রে? খাবি নাকি, অনেকখানি মোচার ঘণ্ট আর ডালনা আছে।

—এখন না, পরে কেমন? জান ঠাকুমা বাবার সঙ্গে সকালবেলা একটা লোকের কত ঝগড়া হয়েছে।

—কই শুনিনি ত, কেন রে?

—আচ্ছা কাউকে বলবে না বল, কাউকে কোনদিন নয়?

—নারে না বলব না।

—লোকটা বাবাকে চোর বলেছে। ছোট খুকুর জামার কাপড় নাকি তার—কেন চোর বলেছে ঠাকুমা ওইটুকু কাপড় নিলে চোর হয় নাকি? তারপর থেমে একটু পরে বলল : জান মা কেঁদেছে কত। কারো সঙ্গে কথা কয়নি। রান্নাও করেনি আজ—

শিউরে উঠলেন শৈলবালা, সারাটা দিন এই কচি শিশুরা না খেয়ে আছে। ধন্য ঝগড়া বাবা! এবার বললেন শৈলবালা : তবে যে বললি খেয়েছিস বিশু?

—সে ত মা বললে—কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি ভাত খেয়েছি, মার কথা শুনতে হয় না ঠাকুমা?

সস্নেহে এবার বললেন শৈলবালা : তা ত বটেই! যা বিশু তোর দাদা আর ছোট খুকুকে ডেকে আনগে যা। তারপর একসঙ্গে বসে খা।

—দাদা ত বাড়ী নেই ইজের বেচতে বেরিয়েছে সেই কোন সকালে।

শৈলবালার চোখের সামনে কেবলি ভেসে বেড়াতে লাগল একটি রৌদ্র দগ্ধ তামাভ্র কিশোরের ক্ষুধার্ত মুখ।

বিশু এবার তাড়া দিল : তবে কি হবে খালি খুকুকে ডাকব না একাই বসে যাব।

বিশু, শিশুদের বাবার কথা মনে পড়ল শৈলবালার। নিরীহ গোছের চেহারা, ক্লান্ত, খোঁচা খোঁচা একগাল দাড়ি, নির্বোধ চাউনি। মা-বাবা ত জেগে ছেলেদের জামা-ইজের কাটে, সেলাই করে স্বামী-স্ত্রী মিলে, আর তারই বিক্রীর চেষ্টা চলে সারাটাদিন।

বাড়ীর টুকিটাকি সেলাই ফোঁড়াইর জন্য লোকটা অনেকবার এসে বলে গেছে শৈলবালা, অমিয়কান্তি এমন কি স্নুলতাকেও।

—দেবেন স্যার আমাকে সেলাই ফোঁড়াইএর কাজগুলো। বাইরে থেকে ত করান, এবার থেকে আমাকেই খবর দেবেন।

অমিয়কান্তি অবশ্য গররাজি হয়নি। ভাল কথাই, সুবিধে কত, কাটিং উনিশ বিশ হয়ত হবে এবং দামটাও নিশ্চয়ই কম হবে চার ছ' আনা। তাই বা কম কি এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে?

সুলতা অবশ্য হেসেই অস্থির: তবেই হয়েছে মাগো! আর লোক পেলে না—তোমার সার্ট শেষকালে ফতুয়ায় না গিয়ে দাঁড়ায়?

—চেহারাটা সব সময় বড় নয় সুলু কার মধ্যে কি আছে কে জানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ চেহারাটাই সব। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় কে কোন কাজের উপযুক্ত।

—বাইরের চেহারা দেখে লোকের বিচার করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়, তাছাড়া লোকটার কি এমন একটা দেখলে যে তুমি বুঝে গেলে ওর জামার কাটিং ফতুয়ার মত হবে। অভাবের চেহারা বলে এই রকম তা না হলে দাড়ি কামিয়ে পরিষ্কার জামা জুতো পরলেই আবার দেখবে অন্য মানুষ!

—ও আমরা পারি গো, ওটুকু না বুঝলে আমরা যে মিথ্যে হয়ে যাই। মেয়ে হয়ে জন্মেছি—মনে নেই তুমি যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমি কি বুঝিনি আসলে—

কৃত্রিম কোপে অমিয়কান্তি বলল: ও এই—তুমি যে আগুন রোদে মানুষ ঘরের বাইরে বেরুতে পারে না, ছাদে এসে চুল শুকোতে সেকি আর আমি বুঝতাম না ভেবেছ? কলেজের সকলকে ডেকে এনে দেখাতাম বেহায়া মেয়ের কাণ্ডটা!

—যা সত্যি?

অতীতের স্মৃতি রোমন্থনের আবেশে মেদুর দৃষ্টি নিয়ে স্বামীর কাছে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বসল সুলতা। বলল: আচ্ছা মাকে বলছিলে, মা জানতেন সব?

—সব না হোক অনেকটাই জানতেন, বাকীটা দেখতেন—বলল অমিয়কান্তি।

—তুমি বলেছিলে, বলতে পারলে ?

—সব কি আর বলতে হত—একমাত্র ছেলের চুলে তেল নেই, নাওয়া-খাওয়া ঠিক নেই, উদাস উদাস ভাব—তার ওপর ঘর থেকে নড়বার নাম গন্ধ নেই, সকাল বিকেল বেড়ান বন্ধ এমন কি কলেজ কামাই সুরু হল শরীর খারাপ অজুহাতে—

—বাঃ বাঃ এত সমস্ত করেছিলে ? আর এতদিন সাধু সাজা হয়েছিল ? মাকে আমার এত ভাল লাগে নিজের মায়ের মত—

—আর মায়ের ছেলেকে কার মত ? পাঁচু গয়লার মত ?

—যা ছোটলোক কোথাকার, মুখের লাগাম নেই—

—লাগামে কি আর মুখ বন্ধ হয় তার জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে, বলত আমি মুখ বন্ধ করতে রাজী আছি।

—না অত সস্তা নয়। আমি মায়ের কাছে যাই, রামায়ণ শুনিগে বাবা এখানে কি আর রক্ষা আছে।

মাঝে মাঝে শৈলবালাও বলেছেন : দাও না মা তোমার ঘরোয়া জামাগুলো একতলার ওই বিশুর বাপকে। অন্যকে দিয়েও করাচ্ছ ওকে দিয়েও করিয়ে দেখনা কয়েকটা পারে কিনা ?

সুলতা বললে : আপনাকেও বলেছে বুঝি মা ? আচ্ছা লোক ত- এই ত সেদিন আপনার ছেলেকে বলে গেছে একবার। তারপর নীচের বৌটা কালকে আমায় একবার বলেছে, আজকে আবার আপনাকে—

—না না আমাকে কিছু বলেনি। নীচে যাবার সময় দেখা হল বৌটার সঙ্গে, দেখে ভারী মায়া হল - অমন রোগা বৌটা তারপর পেটে একটা নিয়ে পা-কল চালাচ্ছে দেখলাম। একটা না কেলেঙ্কারী করে বসে।

—আসলে আপনাকে ভাল মানুষ পেয়ে একটু মন ভিজিয়েছে। ওসব ন্যাকামী—ছোটলোকদের কি আর সে জ্ঞানগম্যি আছে, টাকাটাই বড় ওদের কাছে—

মনে পড়ল সুলতার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নাবার সময় কতবার দেখেছে প্রায়ান্ধকার ঘরে অল্প পাওয়ারের আলোর নীচে ক'টি প্রাণী। একটি পুরুষ ও একটি নারী আর তাদের সন্তান-সন্ততি। মেঝেতে দু'এক খানা কাপড়-চোপড় ছড়ানো, কাটা। নিয়ম মাফিক। তার সঙ্গে মেঝেতে ক'টা শিশু আর আলোর নীচে সেলাইয়ের কলের সামনে এক জোড়া মানুষ। মুমূর্ষু, ক্লান্ত, জীবন-যুদ্ধে পর্যুদস্ত। একজন কাটে আর একজন ঝুঁকে পড়ে কল চালায়, সেলাই করে।

এরমধ্যে বৌটার সঙ্গে দু'একটা কথা হয়েছে সুলতার, অমিয়কান্তির সঙ্গে হয়ত বেরুচ্ছে বেড়াতে, কার্জন পার্ক বা সিনেমায়। ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে নির্জীবের মত দাঁড়িয়ে শ্বাস টানছে বৌটা। ফ্যাকাসে ক্লান্ত চোখে চেয়ে জিগ্যেস করেছে: বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি দিদি? আপনারা দু'টিতে আছেন বেশ। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই—

কিম্বা ফেরার সময় উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়তে পড়তে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে সুলতা, প্রায়ান্ধকার ঘর থেকে কেমন যেন অদ্ভুত নিস্পৃহ গলায় প্রশ্ন এসেছে: ফিরলেন এতক্ষণে, সিনেমায় গেছলেন বুঝি? এরসঙ্গে স্বগত উক্তি পর্যন্ত শোনা যায়: কতদিন যে সেনেমায় যাইনি—আহা কতদিন! তারপর নিঃশব্দ ঘর দোর। সিঁড়ি না পেরুন পর্যন্ত সুলতার কথা ফুটত না। সর্বক্ষণ মনে হয়েছে কারো নির্জীব চাউনি। দরজার কাছে হেলান দেওয়া অনেকদিনের চেনা ভঙ্গিটি পর্যন্ত। একতলার আবছা অন্ধকার বারান্দার ছায়া রহস্যময়, সিঁড়ির ধাপে ধাপে পুরু অন্ধকার, একটা ভ্যাপসা গন্ধে জড়ানো বাতাস। অস্বস্তিকর পরিবেশ।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছে অমিয়কান্তি: কি ব্যাপার, একেবারে চুপচাপ মেরে গেলে যে?

কিন্তু যতক্ষণ না অমিয়কান্তির কাছ ঘেঁষে সিঁড়ি ভেঙ্গে একেবারে দোতলায় উঠে আসছে, নীচের সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের

বিন্দুটি পর্যন্ত মিলিয়ে গেছে আর একটানা কান্নার মত সেলাই কলের অবিরাম আওয়াজ স্তিমিত না হয়েছে ততক্ষণ যে সহজ হতে পারেনি সুলতা। তারপর ওপরে পৌঁছে নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে করে কথা বলল যেন সুলতা : আমার কেমন যেন ভারী বিশ্রী লাগে। সহ্য হয় না কিছুতেই—

বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকায় অমিয়কান্তি সুলতার দিকে। খুসীতে হাসিতে ডগ্‌মগ্‌ সুলতা ফেঁপে উঠেছে। ফেটে পড়তে চায়। যেন মুহূর্ত আগেকার ঘটনার কোন স্বীকৃতি নেই তার কাছে। ওপরে, দোতলায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে নীচের প্রায়ান্ধকার ঘরের রুগ্ন, নিরুত্তাপ ইতিহাস মুছে দিতে চেয়েছে মন থেকে।

তবুও মাঝে মধ্যে বিশু এলে ছলাৎ করে ওঠে বুকের ভেতরকার রক্তের স্রোত। কোথায় যেন একটা কঠিন পরিবর্তন মনে হয়েছে। বিশুর রুক্ষ চুলের গোছায় লাল আভা। ঘাড়ের কণ্ঠায় হাড় সুস্পষ্ট। মুখের সুকুমার লালিত্য নিঃশেষিত বহুদিন। শুধু নির্মল শান্ত চোখের উজ্জ্বল জ্বালাময়ী চাউনী।

শৈলবালা প্রশ্ন করেন : হাঁারে, বিশু, শিশু খেয়েছে নাকিরে ? আজ রান্না হতে কত দেরী তোদের ?

চট্‌ করে উত্তর দিতে পারে না বা উত্তর দেয় না বিশু। চুপ করে থেকে এদিকে ওদিকে তাকায় নিশ্চুপ উদ্দেশ্যহীন—চোখের নীলাভ তারায় আশ্চর্য বিদ্যুতের প্রস্তুতি। এক মিনিট চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে বলে : আজ ত রান্না বন্ধ—

তবু মাঝে মাঝে হাত পেতেছে সকাল সন্ধায়। কখনো বা শীর্ণ মুখ আরো শীর্ণতর, অপরিষ্কার খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি মুখ। সকালে বিকেলে সাহায্য চেয়েছে ওপরে এসে : দেবেন স্যার কিছু, দয়া করুন। শীর্ণতর হাতটা চোখের সামনে এসে স্থির হতে চেষ্টা

করে। পরে থরথর করে কাঁপতে থাকে: বেশী নয় মাত্র গোটা কুড়ি টাকা—না পেলে সপরিবারে মারা পড়ব।

বিরক্তিতে নাকের ডগা কুঁচকে আসে সুলতার।

ড্যাবড্যাবে ম্লান চোখ আর অসহায় চেহারা। হাত পাতে কিছু দিন: স্যার সাহায্য করুন—

কান্নায় উসখুস করেন শৈলবালা।

আর অমিয়কান্তির চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে।

কিন্তু কঠোর সুলতা নির্বিকার।

দু' একদিন বাদে সকালে গোলমালের মধ্যে যেন ঘুম ভেঙে গেছে সকলের। অমিয়কান্তির বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখল সুলতা কিন্তু অমিয়কান্তিকে দেখতে পেল না। অমিয়কান্তি তখন বাইরে রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। নির্বিকার ভাবে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে আছে। লাল আর টানটান যেন সারাটা মুখ।

সুলতা তখন এগিয়ে এল অমিয়কান্তির কাছে। তারপর রেলিঙের ওপর দিয়ে তাকাতে চোখে পড়ল, ক'জনে মিলে নীচের সেলাই কলটা একটা লরীতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আর একটু দূরে নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে সংগ্রামী মানুষটা। যেন কোন দায় নেই আর। ঋণ মুক্ত। রাস্তার ফুট-পাতে কাঁদছে রোগা ফ্যাকাসে বৌটা। মাথার ঘোমটা খুলে গেছে, আলুথালু কাপড় চোপড়, বিবর্ণ একগোছা চুল ভেঙে পড়েছে পিঠে।

আর সেলাই কলের ফ্রেমটা ধরে প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে বিশু আর শিশু। আর বলছে: এস, ধর বাবা—তুমি একটু ধর। ওরা যে সব নিয়ে গেল বাবা—

বিকেল বেলা অফিস থেকে ফেরার সময়, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় একটু যেন থমকে দাঁড়াল অমিয়কান্তি। আবার সেই সেলাই কলের আওয়াজ। অবাক হল অমিয়কান্তি! তবে কি আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে কোনমতে। কৌতূহলী চোখে আধ ভেজানো পাল্লার মধ্য দিয়ে চাইতেই চমকে উঠল অমিয়কান্তি, কে একজন হাত মেসিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি একটা যেন সেলাই করছে। একটু দূরে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা লোকটা বোকার মত কাঁচু-মাঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে।

সেলাই ছেড়ে একবার উঠে দাঁড়াল সে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া ঘাম মুছতে দেখে ভাবল অমিয়কান্তি কালকেই স্বলুর চোখ দেখানো দরকার, চোখ খারাপ কথাটা মোটেই মিথ্যে নয় ওর।

রেণু বৌদি

ডিসেরগড় এমন কিছু জায়গা নয় যে, মনে রাখতে হবে। এরকম কত জায়গায় ঘুরেছি আমি। কই কোন জায়গার কথা ত মনে নেই। জোর করে ভাবতে গেলে কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। তবে ডিসেরগড়কে ভুলতে পারছি না কেন ? কি এমন আছে সে দেশে ?

আছে শাল মহুয়ার গাছ।

আর কোলিয়ারী—লরি লরি কয়লা চালান হচ্ছে এদিকে-সেদিকে।

এই কি সেই এমন জায়গা যাকে মনে রাখার মতন। যাকে কিছুতেই ভুলতে পারা যায় না। ভুলতে গেলে লাগে। অকারণে বুঝি রক্ত ঝরায়। আর মনটা কেঁদে কঁকিয়ে একলা হয়ে যেতে চায়।

ডিসেরগড়কে তবু ভোলা যায় না।

ভুলতে পারলে যেন ভাল হত ! বেঁচে যেতাম আমি।

ট্রেন ষ্টেশন ছেড়ে চলে গেলেও যেমন শব্দ তবুও থাকে তেমনি বুঝি স্পন্দন আমার মনে থেকে গেছে।

—আরে কুন্তল, তুই এত রাত্তিরে—

—হ্যাঁ, মাসীমা। কতদিন ধরে তোমাদের এখানে আসব ভাবছি। কিন্তু সময় মোটেই করতে পারি না—তারপর কোনরকমে জোর করেই ছুটির দরখাস্তখানা সাহেবের টেবিলে রেখে গোমো এক্সপ্রেসে একেবারে বরাকর। তারপর সেখান থেকে একেবারে তোমাদের এখানে।

—আসতে কোন কষ্ট হয়নি ত বাবা ?

—না, ট্রেনে তেমন—তবে তোমাদের কোয়ার্টার খুঁজে বার করতে একটু কষ্ট হয়েছে। তবে মেসোমশায়ের নাম করে ক্যালকাটা কোল কোম্পানীর কোয়ার্টার বলতে তবে দেখিয়ে দিয়েছে—

—তবে এখন হাত মুখ ধুয়ে নে—রাতের রান্না ত হয়ে গেছে। খেয়ে নিতে পারিস।

—দাঁড়াও, এত তাড়াতাড়ি খাবার কি হয়েছে?

—তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। ট্রেনের ধকল—

—কিন্তু মেসোমশাই—। মাসীমার কথা থামিয়ে দিয়েছিলাম।

—তোর মেসোমশাই ত ক্লাবে গেছেন। ফিরতে রাত হবে। আচ্ছা ওই তাস-পাশা ছাই পাঁশ এত খেলতে পারে—রোজ রোজ ভালও লাগে খেলতে? তুই বল ত কুন্তল—। খানিকটা বিতৃষ্ণা ছিটকে বেরোয় মাসীমার মুখ থেকে।

আমি অবশ্য বোকার মতন চুপ করে থাকি।

মাসীমা কেমন গুম মেরে যান। রাগের বারুদ যে জমতে থাকে এ বেশ বুঝতে পারি।

তবু আমি কথার মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করি: মণ্টু কোথায়? রীণা-মীনা?

—ওরা হয়ত ও ঘরে পড়ছে—ডাকব নাকি?

—না আমি নিজেই যাচ্ছি।

ওদের পড়ার ঘরে ঢুকতে রীণা, মীনা আর মণ্টু ঘিরে ধরল আমায়।

—আরে কুন্তলদা—

—ওমা তাই ত—এদ্দিনবাদে তবু মনে পড়ল।

—কি এনেছ কুন্তলদা? হাতটা জড়িয়ে ধরল মণ্টু।

—হ্যাঁ কর দেখি আগে—

মন্টু হাঁ করতে কয়েকটা চকলেট দিয়ে বললাম : বলত কেমন লাগছে ?

চকলেটের রস গিলে ফেলে মন্টু বলল : আঃ, আঃ কি সুন্দর—

এই নে তোর ফিতে মীনা।

—আর আমার জন্য কি এনেছ কুন্তলদা ?

—গল্পের বই—

আবার রীণা বলল : গল্পের বই এনেছ। উঃ, কতদিন যে গল্পের বই পড়ি না—ক্লাব থেকে যে বই আসে, বাবা কিছুতেই তা হাত ছাড়া করেন না।

—একটু চা খাওয়া ত—

রীণা তাড়াতাড়ি ছুটল চা আনতে।

মেসোমশাই কত রাত্তিরে ফিরেছেন জানি না। তার ফেরার আগেই খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। একটু হয়ত ঘুমের তন্দ্রা সবে জমতে শুরু করেছিল চোখের উপকূলে, হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল—ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ঘুমের নাও তখন তন্দ্র-ভাঙা ঘাটে ঠেকে গেছে।

কান্না—

কে যেন কাঁদে না ? মেয়েমানুষের গলায় কে যেন কাঁদছে।

কিন্তু কেন ?

তবু শুনতে লাগলাম। কান পেতে কান্না শুনতে লাগলাম। বিনিয়ে বিনিয়ে কে যেন কাঁদছে। কান্নার ভেতরেও যে সুর আছে জানতাম না।

কিন্তু কে কাঁদে ? কেন কাঁদে ?

অজস্র চিন্তা একটা একটা করে স্বাভাবিক ভাবেই সামনে এসে দাঁড়ায়। জবাব না পেয়ে ফিরে যায়। তবু চিন্তাগুলোর আসা-যাওয়া থামে না। থামতে পারি না আমি। অজস্র তারাভরা আকা-

শের দিকে তাকিয়ে থাকি। দৃষ্টি গিয়ে থমকে যায় সবচেয়ে উজ্জ্বল বড় তারাটার দিকে। তারারা কি উত্তর দেবে আমায়?

বইয়ের পাতাই উল্টে যাচ্ছি। এক লাইনও পড়তে পেরেছিলাম কিনা জানি না। কাল রাতের কান্নার গান এখনও আমার মনে মোহ ছড়িয়ে আছে। কান্নার কি সুর আছে? মাসীমাকে জিগ্যেস করতে পারিনি। লজ্জার মেঘ কথার সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে বারবার। তবু মন জানতে চাওয়ার ব্যথায় রঙিন হয়ে উঠতে চায়।

মাসীমা বসে আছেন পাশে। বললেন এক সময়ঃ কাল রাতে ঘুমোতে কোন কষ্ট হয়নি ত বাবা?

না মাসীমা। মিথ্যে বলে থামিয়ে দিয়েছিলাম মাসীমাকে। মাসীমা হয়ত বিশ্বাস করলেন আমার কথা। কিন্তু কেন যে মিথ্যে বললাম নিজেই বলতে পারি না। তবে মনে আছে মনটা বইয়ের পাতায় ছটফট করে বেরিয়েছে। তারপর অনুভূতি কেমন অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল। বইয়ের পাতায় তখন আর মন নেই। তাকিয়ে আছি মাসীমার দিকে। আর মাসীমার কথাগুলো লক্ষ্য করছি।

—আরে রেণু পালাচ্ছ কেন—কাকে দেখে লজ্জা করছ? ও ত কুন্তল আমার বোনের ছেলে। এখানে বেড়াতে এসেছে—

যাকে উদ্দেশ করে মাসীমা কথাগুলো বললেন তাকে বুঝি থামতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। ঘোমটা টেনে আর পালাতে পারল না। তবে বেশীক্ষণ দাঁড়াল না আর। চলে গেল।

বই তখন মুড়ে ফেলেছি। ভাবছি কে এই নারী? চোখ ধাঁধানো রূপ যার। এত রূপের কাছাকাছি কোনদিন আমি আসিনি। তাকিয়ে ছিলাম যতক্ষণ ঘরে ছিল। মাসীমার কথায় চোখ তুলে তাকিয়ে ছিল একবার। চোখে চোখ পড়েছিল বুঝি। অদ্ভুত শিহরণ। অতলান্ত একজোড়া কালো চোখের কি গভীর দৃষ্টি। মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে-ছিলাম শুধু।

কদিনেই যে রেণু বৌদিকে এত কাছাকাছি পেয়ে যাব ভাবতেই পারিনি। লজ্জার চড়াই কবেই উড়িয়ে দিয়েছে রেণু বৌদি। বলেছে, তোমার কথা ভাই কাকীমার কাছে অনেক শুনেছি—তবে দেখা বাকী ছিল; তাও হয়ে গেল।

—তাই নাকি? হাসতে হাসতে আমি বলি।

—উঁহু হাসি নয়। কেমন ছল্‌ছল্‌ করে ওঠে রেণু বৌদি।

বুঝলাম ব্যাপার সুবিধা নয়। বলেছিলাম: আমি ঠাট্টা করছিলাম—

উঁহু, এবার আর আপনি নয় মোটেই। রেণু বৌদির মন থেকে অভিমানের মেঘ বুঝি সত্যি সরে গেল।

—কিন্তু—

—কোন কিন্তু আমি মানব না তা বলে রাখছি।

একদিন সেদিন রীণা, মীনা, মাসীমা আর আমি গল্প করছিলাম। সকাল থেকেই বৃষ্টি নেমেছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আর আকাশটা কেমন ঘোলা ঘোলা। জানি এ বৃষ্টি সহজে থামবে না। ভালো লাগে না আমার। মনটা স্যাঁতস্যাতে হয়ে গেছে। রেণু বৌদি এল। একেবারে আমাদের মধ্যে এসে বসল। বলল, তারপর কিসের গল্প হচ্ছে আপনাদের?

—কি জল শুরু হয়েছে দ্যাখো দিকিন! মাসীমা বললেন।

—আমার কিন্তু বেশ লাগছে মা। দেখছ কেমন তালে তালে জল পড়ছে। যদি কবি হতাম মা, এ বৃষ্টি নিয়ে নিশ্চয় কবিতা লিখে ফেলতাম। রীণা আরও বলে: তুমি কি বল কুন্তলদা?

—আমি আর কি বলব—কিন্তু তোমার এ ভাল লাগাকে কিছুতেই তারিফ করতে পারলাম না। হয় খুব জোরে হোক না হয় ত থেমে যাক।

—ঠিক বলেছ ভাই কুলদা। আমিও তাই বলি। কিছুক্ষণ পরে রেণু বৌদি আবার বলে: তোমাকে তুমি বললাম, এ জন্যে কিছু মনে করলে না ত ভাই ?

আমার হয়ে মাসীমাই জবাব দিলেন: তাতে কি হয়েছে, তুমিও রীণা মীনার মত কুন্তলেরও বৌদি হও।

—বয়সে বড় না হলেও মর্যাদায় ত বড়—কি বলুন কাকীমা' তাই না ?

—হাঁ। সমস্যার সমাধান নিজেই করে ফেলি আমি।

এ কদিনে রেণু বৌদি অনেক সহজ হয়ে এসেছে আমার কাছে। আমাকেও নাকি রেণুবৌদির খুব ভাল লেগেছে। রেণুবৌদি অবশ্য তাই বলে: তুমি এত হাসো কি করে বলত ভাই কুন্তল ? এজন্য তোমাকে এত ভাল লাগে—

এটা যে আমিও ভাবিনি এমন নয়। শুধু রেণুবৌদি কেন সবাই আমার এ গুণের প্রশংসা করে।

এমনি করে এক একটা দিন ঝরা পাতার মত ঝরে যায় টুপটাপ্ আর আমি রেণুবৌদির আশায় পথ চেয়ে থাকি কেন আসছে না, রেণুবৌদি ? রেণুবৌদি না এলে—রেণুবৌদিকে কাছে না পেলে সারা দিনটাই মাটি। কিছুই ভাল লাগে না তখন। বই নিয়ে হয়ত বসলাম। না ওই পর্যন্ত। এক লাইন যদি পড়তে পেরেছি। নয়ত গল্প করতে বসেছি আমি, রীণা আর মীনা। কিন্তু কোথায় গল্প ? ওরা বকে চলেছে এক নাগাড়ে। না পারছি ওদের কোন কথা শুনতে আর না দিচ্ছি কোন জবাব। রেণুবৌদি নেই, গল্প টল্প জমবে কাকে নিয়ে! তাইত মন তখন উধাও। হয়ত খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই একজনকে যার অতলান্ত কালো চোখের ছায়ায় হারিয়ে যেতে চাই।

আবার কান্না।

ঘুম ভেঙে গেল আমার। সেদিনের মত আবার উঠে বসলাম। ঘুমোতে আর পারলাম না। না ঘুমিয়ে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম।

পরের দিন ভেবেছিলাম মাসীমাকে জিজ্ঞেস করব, রাতে ডিসের গড়ে কে কাঁদে? তার ওপর আবার মেয়েমানুষের কান্না। কিন্তু জিজ্ঞেস করার সুযোগ আমি আর পেলাম না। কথায় কথায় রীণা বলল: জানো কুন্তলদা, সুধীরবাবু রেণুবৌদিকে মারে। কাল রাতে কান্না শুনতে পাওনি, রেণুবৌদি ত কাঁদছিল—

সুবীরবাবু কে রে?

কেন রেণুবৌদির স্বামী। বাবার সঙ্গে একই অপিসে কাজ করে। যেদিন মদ খেয়ে আসবে সেদিন মারবে—

মনটা সত্যি ভেঙে গেল।

রেণু বৌদিকে প্রহার করতে পারে এ আমি ভাবতে পারিনা। যার কালো চোখের ছায়ায় শান্তি পাওয়া যায় এবং যার হাসি বাঁধন-হারা ঝর্ণাধারার মত উচ্ছ্বসিত। নিজেও ভেসে যায়, ভাসিয়েও নিয়ে যায়। আর রূপ—বাতিঘরের মত মতিচ্ছন্ন মানুষকে সংসারের লোভানি দেয়।

বিকেলে আমি আর রীণা বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম।

রেণু বৌদি এসেছিল। তারপর একরাশ যুঁইফোটার মত হাসি ছড়িয়ে বলেছিল: কোথায় যাচ্ছ তোমারা?

—তুমিও যাবে নাকি রেণু বৌদি? রীণা বলল।

রেণু বৌদি তৈরী হয়েই এসেছিল। বলেছিল: হ্যাঁ, চল—

বেড়াতে বেড়াতে দামোদরের কাছে চলে এলাম। দামোদরের অবস্থা দেখে কান্না পেল আমার। দামোদরের সেই দাপট আর নেই। ডি, ভি, সি, পরিকল্পনা একেবারে পঙ্গু করে রেখেছে।

আমাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রেণু বৌদি বলল : যাবে, না এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে ?

রেণু বৌদির দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম : না, যাচ্ছি—

বিকেল অনেক আগেই হয়েছিল। আর ছিল ঝিরঝিরে বাতাস। সূর্যের শেষ রক্তিম-আভাটুকু আকাশের পশ্চিম কোণায় লেগেছিল। কয়েকটা মহুয়া গাছ পেরিয়ে যেখানে লাল পলাশগাছ—তার ভেতর দিয়ে কোন কোম্পানীর লাল সুরকির রাস্তা চলে গেছে। সেটা ধরে আমরা চলেছি। আর রাস্তার এপাশে ওপাশে সবুজ ঘাস।

একসময় রেণু বৌদি বলল : কি সুন্দর ঘাস তাই না ?

—হ্যাঁ, কি সবুজ ! বসে পড়েছিলাম তিনজনে ঘাসের ওপর। কি সুন্দর দেখাচ্ছে রেণু বৌদিকে। সূর্যের শেষ আলোটুকু রেণু বৌদিকে আরও সুন্দর করে গেছে।

জীবনে এমন কতগুলো ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় যার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। ঘটনা ঘটে গেলে যেন না জানা রহস্যের দরজা খুলে যায়।

মাসীমা, রীণা, মীনা এমনকি মন্টু কেউই বাড়ীতে ছিল না। নেমন্তন্নে গেছিল। মাসীমা অবশ্য বলেছিলেন : কুন্তল, যাবি না ?

—কোথায় মাসীমা !

—কেন, নেমন্তন্নে যাচ্ছি আমরা—

—না। আমার আবার কারও বাড়ীতে যাওয়া তেমন ভাল লাগে না।

তারপর সবাই চলে গেল।

শুয়েছিলাম। কোন কিছুই তখন ভাল লাগছে না। মনটা অনেক কিছু ভাবতে চায়। রেণু বৌদি ! তন্দ্রার মত এসেছিল,

ঘুমিয়েও পড়েছিলাম বুঝি। মনে হল কেউ যেন মাথায় হাত রাখল। ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। অথচ তন্দ্রা ঠিকই লেগে রইল দু'চোখে। কই বাড়ীতে কেউ নেই। সবাই নেমন্তন্নে গেছে। তবে কে? ভাবতে থাকি আমি। রেণু বৌদি? ভাবনার যেন শেষ নেই তবুও। যদি রেণুবৌদি না হয়—তখন? এমনি সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকি। তবুও চোখ খোলার ভরসা পাই না। রেণু বৌদি না হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু স্বপ্ন যেন না ভেঙে যায়। অনিচ্ছার মধ্যে ইচ্ছা বেঁচে ওঠে। চোখ খুলে ফেলি। আর অবাক হই: রেণু বৌদি, তুমি? আমার বিহ্বলতা তখনও কাটেনি।

কি রকম যেন দৃষ্টি দিয়ে রেণু বৌদি আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। ঠোঁট দুটো হিজিবিজি আঁকে। কোন ভাষা নেই মুখে।

আমি কেমন তন্ময় হয়ে থকি। আমার মাথায় রাখা হাতটা টেনে নিয়ে আসি বুকের কাছে।

এবার যেন রেণু বৌদি চঞ্চল হয়ে ওঠে: কুন্তল, পারবে না তুমি?

কি বলছে রেণু বৌদি কিছুই বুঝতে পারি না আমি। রেণু বৌদির হাতটা শুধু শক্ত করে ধরে থাকি।

রেণু বৌদি বলতে থাকে: তুমি পারবে কুন্তল এই ডিসেরগড় থেকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে—

চুপ করে থাকি আমি।

—আমি আর এ জ্বালা সহ্য করতে পারছি না—পারবে না কুন্তল?

আমি যে কি করবো ভেবে পাই না। তখনও তাকিয়ে থাকি রেণু বৌদির মুখের দিকে।

হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে রেণু বৌদির চোখ দুটো : বল কুন্তল—। আলগা পিঠাটাকে দেখিয়ে বলল : বল এবার পারবে ? সাপের চোখের মত জ্বলছে রেণু বৌদির চোখ।

চমকে উঠলাম আমি। ইস্ ? এ কি হয়েছে! সারা পিঠটায় কে যেন চাবুক চালিয়েছে। রেণু বৌদিকে কাছে টেনে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলাম : ইস্! এমনকরেও মানুষে প্রহার করে—

চোখের আগুন নিভে গেল রেণু বৌদির। কান্নার বন্যায় চোখ দুটো ডুবে গেছে। রেণু বৌদি ভেঙে পড়ল আমার কোলে।

এরপরে রেণু বৌদিকে এমন ভাবে দেখব আশা করতে পারিনি আমি। ঘরে বসে একখানা চিঠি লিখছিলাম আপিসে। আরও কয়েকদিনের ছুটি চাই। এখানকার পরিবেশ আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। মাসীমা, মেসোমশাই, রীনা, মীনা, মন্টু আর রেণু বৌদি। মহুয়া, পলাশ—আর পঙ্গু দামোদর—

রেণু বৌদি ঘরে এসে ঢুকল : কাকীমা—

চিঠি লেখা আর হল না। ভেবেছিলাম রেণু বৌদি এগিয়ে আসবে। অপেক্ষা করলাম। রেণু বৌদির অহেতুক দেরী দেখে ছুটে গেলাম আমি। হাতটা ধরে বললাম : এ রকম ভাবে চুপচাপ কেন রেণু বৌদি—

হাতটা ঝাকানি দিয়ে ছাড়িয়ে নিল। তারপর ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেল। প্রথম যেদিন রেণু বৌদিকে দেখেছিলাম, সেদিন এ রকমভাবেই চলে যেতে দেখেছিলাম—

এ অভাবনীয় ঘটনার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। ভেবে পেলাম না আমি, এমন কি করেছিলাম ?

তারপর আরও কয়েকটা দিন ডিসেরগড়ে ছিলাম।

রাতে ঘুমোতে পারতাম না। একটা বেজে যেত। লাষ্ট ডাউন মালগাড়ী হুইসিল বাজাতে বাজাতে চলে গেল। তবুও জেগে থাকতাম। আর অপেক্ষা করতাম পরিচিত কান্না শোনার জন্য। কিন্তু কোন কান্নাই আর শুনতে পেতাম না।

রেণু বৌদি আর কাঁদে না!

কুকুর

ফুটপাতে বসে কুকুরের মত জিভ বার করে হাঁপায় ইয়াসিন। নিজের দিকে বার বার অসহায়ের মত তাকায় আর নিজেকে ভারী দীন বলে মনে হয়। অতবড় দসাই একটা চেহারার মালিক— একটা ঘুসি মেরে যে কোন মানুষের মাথা ডিমের খোলার মত গুঁড়িয়ে দিতে পারে। একটা লাঠি হাতে থাকলে পঁচিশ, ত্রিশ জনের মহড়া নিতে পারে একলাই কিন্তু এখন ভারী অসহায় আর বোকা বোকা বলে মনে হয় নিজেকে। স্তিমিত আর বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকায় চারদিকে। মুখে কেমন একটা সর্বত্যাগী রিক্ততার আভাষ। পঁয়তাল্লিশ বছরের ভারবাহী জীবন টেনে টেনে আজ যেন হঠাৎ অনেকখানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পঁয়তাল্লিশ বছরের ক্লান্তি দৈন্য যেন জড়িয়ে গেছে স্নায়ুর সঙ্গে। সারা শরীর তার অসীম ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। দাড়ির খাঁজে খাঁজে পড়েছে মিহি ধূলোর স্তর। ঈষৎ তামাটে রং ধরেছে সারা মুখটায়। বিড় বিড় করে বকে ইয়াসিন : ইয়া আল্লা তেরী দুনিয়ামে এইসা বেইন্‌সাফী—এক আদমী ভুখা সে মর যাতা আউর এক আদমি আমির বনতা। এইসা বেইন্‌সাফি কেঁউ তেরী দুনিয়ামে? একটু থামে ইয়াসিন। পিচ করে এক গাদা থুতু ফেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে : হম্‌ নেহি মানসেকুগে—তেরী বেইন্‌সাফী নেহি মানসেকুগে। রোদে আর দারুণ উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠে সারা মুখ। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় কোটর থেকে। কেমন একটা শাণিত বর্শার ফলার মত দৃষ্টি।

হঠাৎ চুপ করে যায়। আবার যেন ঝিমিয়ে পড়ে। বিড় বিড় করে বলেঃ ইয়া আল্লা—। আস্তে আস্তে বকে চলে আর মাঝে মাঝে তাকায় আকাশের দিকে। যেন চ্যালেঞ্জ জানায় ইয়াসিন: তেরী বে-ইনসাফি হম্ নেহি মানসেকুগে।

চেঁচিয়ে এক সময় গলা শুকিয়ে যায়। মুখ নাড়তে পারে না আর, মুখের ভেতরটা যেন চিরে চিরে গেছে। আঠার মত ঘন হয়ে এসেছে থুতু। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় ইয়াসিন। রাস্তার চাপা কল থেকে জল খায় পেট ভরে। তারপর আবার তেমনি রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকে আর বকে।

এখন তার অখণ্ড অবসর। নেড়ি কুকুরগুলো অকারণে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। দূর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নাক লাগিয়ে মাটি শুকতে লাগল। মাঝে মাঝে মাছিকে লক্ষ্য করে বিরাট হাঁ করে গিলতেও যায়। হঠাৎ ইয়াসিনের চিৎকারে চমকে ওঠে কুকুরগুলো। ভড়কে গিয়ে কেঁউ কেঁউ করে দেয় দু' একটা। পেটের তলায় ল্যাজ গুটিয়ে একবার চারিদিকটা ঘুরে এসে তেমনি ইয়াসিনের ছায়াতে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকে। অনেকটা ইয়াসিনের মতই।

মোড়ের ডাষ্টবিনটা অনেকবার ঘুরে এসেছে ওরা। সবাই যেন চালাক হয়ে গেছে। আলু পটলের খোসা, বাসি ছাই, নোংরা কাপড় চোপড় ছাড়া ভাল কিছু খাবার পাওয়া বড্ড কঠিন আজকাল। দু'পেয়ে জীবগুলো ওদের চোখে ভারী বিস্ময়। একদল যে খাবার ফেলে দিয়ে যায় আরেকদল তাদের বঞ্চিত করে সেই খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। ভারী আশ্চর্য লাগে ওদের! পাড়াটা একবার চক্কর দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে সবাই। ইয়াসিনকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে হাই তোলে; চোখ বুজে হয়ত দু'পেয়ে জীবগুলোর স্বপ্ন দেখে। ইয়াসিনের মতই হয়ত দু চারদিন খায়নি ওরা অনেকেই।

বসে বসে একসময় ভারী অসহায় লাগে ইয়াসিনের। কি জানি কি ভেবে মাটি থেকে একটা আধলা ইঁট কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারে কুকুরগুলোর দিকে। অব্যর্থ টিপ ইয়াসিনের। মুহূর্তেই একটা ল্যাজগুটিযে উল্‌টে পড়ে একটানা একটা করুণ আওয়াজ করে ওঠে। বাকীগুলো উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালায়। দূর থেকে ল্যাজ গুটিয়ে ডাকে আর দাঁত খিচোয়। ভীষণ তীক্ষ্ণ আর মর্মভেদী ওদের ডাক। ইয়াসিনের হৃদয়ে যেন গিঁথে যায়। ছলাৎ করে ওঠে বুকের রক্ত। কি হয়ে যায় বুঝতে পারে না। উঠে দাঁড়ায় ইয়াসিন। আর একবারো ফিরে তাকায় না—হন্ হন্ করে চলতে আরম্ভ করে সামনের দিকে। অবাক হ'য়ে যায় রাস্তার লোকগুলো।

—আচ্ছা জানোয়ার ত লোকটা! মন্তব্য করলে একজন: বুড়ো হয়ে মরতে চল্‌ল, একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই।

—ওকেও ওমনি একখানা ইঁট ঝাড়লে বুঝবে। শালা যাক একদিন পাড়ায়। বললে ছোকরা গোছের একটা লোক।

সামনের ফুটপাতের দোকানদাররা পর্যন্ত ঝুঁকে পড়েছে। রাস্তায় লোকের ভীড় জমেছে ক্রমেই। ইঁট খেয়ে সেই ঘুরপাক খেতে সুরু করেছে কুকুরটা এখনো তেমনি চলছে পুরোদমে।

স্কুলের ছেলে কতগুলো দাঁড়িয়েছিলো। তারা সবাই গা টেপা-টেপি করে হাসতে সুরু করে দিয়েছে: হিঃ হিঃ চাঁদু, ওদিকে একবার যা দেখে আয়

—ও আমি অনেক দেখেছি। ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগল: সেই যে সেবার আমাদের কালো গাইটার বাচ্চা হল যেদিন—আবার হাসতে সুরু করে দিয়েছে কোঁচাটা মুখে গুঁজে। লাল হয়ে উঠেছে মুখটা হাসির দমকে দমকে।

পাশেই বুড়ো মতন একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। বেদনায় নৃশংসতায় চোখে জল এসে গেছিল: ছিঃ খোকা তোমরা হাসছ। এমন একটা করুণ অবস্থায় হাসি পায়, লজ্জা করে না?

ছেলেগুলো যেন কানেই শুনতে পেল না। আগের মতই এ-ওর গা টেপাটেপি করতে লাগল।

ভদ্রলোক চটে উঠলেন এবার: যাও-যাও বাড়ী যাও খোকা, কেন মিছে ভীড় করছ?

ছেলেগুলো কিন্তু নড়ে না তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

ভদ্রলোক আবার বললেন: আচ্ছা ত্যাঁদোর ত হে তোমরা শুধু শুধু রাস্তায় কেন দাঁড়িয়ে আছ। যাও না।

এবার একজন ফস্ করে বলে উঠল: বেশ করেছি দাঁড়িয়ে আছি, কার বাবার কি?

—কারো কেনা রাস্তা নয়। সকলের সমান রাইট আছে।

ভদ্রলোক আব কথা বাড়ালেন না। এক পা এক পা করে ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

একজন চাপাকল থেকে টিনের মগে করে খানিকটা জল নিয়ে এসে ঢেলে দিল কুকুরটার মাথায়।

—শালা হারামিকা বাচ্চা মায়া দয়া নেই একেবারে—

—ওদের কি আর সে সব আছে, জাত কসাই একেবারে—

কিছু দূরে গিয়ে ফিরে তাকাল ইয়াসিন। দূরে ভীড় জমে গেছে চলতি লোকজনের। ঘুরে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ। ব্যাপার কি? মনে মনে বললে: শালা কুত্তা মর গিয়া হোগা। একঠো ইটা—এক ইঁটা কো ওয়াস্তা ব্যাস্ খতম্। কেমন যেন অদ্ভুত চোখে তাকাল। হাতে হাত ঘোষে ঝাড়তে লাগল। তারপর এক সময় ছুটেই এসে হাজির হয় ভীড়ের কাছে। দু'হাতে ভীড়

ঠেলে বলে: হটো—হটো—ভীড় হটাও জলদি। লোকজন ঠেলতে ঠেলতে এগোয় পাগোলের মত।

—এই যে শালা আবার রোয়াব নিচ্ছে: লজ্জা নেই। মারব শালাকে দু ঘুঁষি।

—ধোলাই দাও শালাকে। একটা ইট নিয়ে আয় ত, মারি মাথায়, বুঝুক একবার।

—কিসলিয়ে মারডালা কুত্তাকো?

—বল শালা—পোয়াতি ছিল দেখিসনি? বাচ্চা হয়ে গেছে ওর?

বাজ খাওয়া তালগাছের মত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ইয়াসিন। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য—তারপর ঠিক আগের মতই বলতে লাগল: হটো, হটো—আর দু'হাতে লোকজন ঠেলতে লাগল। চ্যাঁচাতে লাগল ইয়াসিন, ফুলে ফুলে উঠছে গলার শিরা; রোদে আর উত্তেজনায় মুখখানা হয়ে উঠেছে লাল।

মাটি থেকে তুলে নিল রক্তমাখা কুকুরটাকে। বুকের কাছে সাপটে ধরল ছেলের মত। ততক্ষণে মরে গেছে কুকুরটা। গরম লোমশ শরীরটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ঈষৎ বোজা চোখ দুটো থেকে গড়িয়ে পড়ছে জলের ফোঁটা। মুখের কস বেয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত। বুকের কাছটা কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল কিছু। নাঃ মরেই গেছে। ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল কুকুরটাকে: মর গিয়া শালা। কুত্তাকো বাচ্চা কুত্তা। হাসল আবার ইয়াসিন: কম জোরী জানোয়ার—একঠো ইটাকা ওয়াস্তা ব্যাস্ খতম্। আবার হাসল ইয়াসিন। কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। ভারী বিশ্রী দেখাচ্ছে—তুম্হারা ক্যা? একঠো কুত্তাকো ঝুটমুট মারডালা তুমসে—হাসি থামিয়ে বলল

ইয়াসিন : উত তুরোজ বাদ খতম হোনেবালী থা। তারপর হঠাৎ কঠিন হয়ে এল গলার স্বর। একটা চাপা গর্জনের মত শোনাল তার কথাগুলো : আদমি মরযাতা যাতা ভুখে ভুখে—এক ঠো রুটি দেনেবালা নেহি সারা দুনিয়ামে—কোই নেহি পোচতা, কাহে এইসি হালত? কোই এক পয়সা ভি নেহি দেতা—আউর উত জানোয়ার। আবার যেন তরল হয়ে এল ইয়াসিন। ঠোঁটের কোণে তেমনি আলতো হাসি।

—শালা তেরা বাপকা ক্যা?

কি একটা বলতে যাচ্ছিল ইয়াসিন। তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল একজন : ফিন্ বাত—শালা ফিন, বাত। তারপর আরো কিছু বলার আগে মারল একটা ঘুষি।

চোখ বুজল ইয়াসিন। নাকের ওপর যেন কি একটা এসে পড়ল। ইলেক্‌ট্রিক তারে সক্ খাওয়ার মত। আরো—আরো একটা। চোখের সামনে হাজার বাতির আলো জ্বলে উঠল। অসংখ্য জোনাকী উড়ছে তারি ভেতরে। চোখ বুজেই ইয়াসিন বুঝল ঘন বড় দাড়ি ভিজে উঠেছে কিসে যেন। হয়ত ঘাম, হয়ত অন্য কিছু—তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ইয়াসিন। একটু ও প্রতিবাদ করল না—দাঁড়িয়ে মার খেতে লাগল। শেষকালে বললে : কেতনা আদমি লেকিন রোটি নেহি মিলতা—মর যাতা ভুখামে, বিনা রুটিসে। আপলোক ত ওহি মানলিয়া—সবকোই ওহি মানলিয়া লেকিন কুত্তাউত—

আরো একখানা ঘুষি আসছিল মুখের ওপর, হাঠাৎ থেমে গেল। হাতটা আবার ফিরে গেল। সমাজের কত অন্যায়, অবিচার মেনে নিয়েছে বাবুরা বিনা দ্বিধায়। রাস্তায় একটা মানুষকে মার খেতে দেখে প্রতিবাদ করেনি কেউ। কেউ একবারও বলেনি, কেন এমন হয়? এমন হওয়া উচিত নয়?

আর একটা কুকুরের জন্য ভারী আশ্চর্য লাগে ইয়াসিনের। মুখে বলে ঃ হমকো দো দোটো বিটিয়া মর গিয়া বাবুজী ভুখে ভুখে। রক্ত গড়াচ্ছে। কয়েক ফোটা গড়িয়ে পড়ছে ময়লা গেঞ্জিটার ওপর। রুক্ষ দাড়িতে রক্তের ছাপ সুস্পষ্ট। আর তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকে যাচ্ছে ঃ আদ্‌মি ভুখে ভুখে মর যাতা। ইয়া আল্লা তেরী ছুনিয়ামে এইসা বে-ইনসাফি ?

মরা কুকুরটা তেমনি উলটে পড়ে আছে। এক জায়গায় রক্তাক্ত কয়েকটা মাংসপিণ্ড। বাচ্চা কয়েকটা। একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখল তারপর কুকুরটার গায়ে একটা লাথি মেরে বড় বড় পা ফেলে চলতে লাগল ইয়াসিন।

আকাশের মধ্যোহ্নে সূর্য তখন ভীষণ তাতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে রাস্তার পিচ। তারি ওপর বড় বড় পা ফেলে চলল ইয়াসিন। বাড়ীতে পাঁচ পাঁচটা প্রাণী চেয়ে আছে তারি মুখ চেয়ে অধীর প্রতীক্ষায়। কখন খাবার নিয়ে ফিরবে ইয়াসিন ? অযথাই আশা দিয়ে এসেছে ঃ জরুর কুছ হো যায়গা আজ। কিন্তু কিছুই হল না—এক পয়সাও হল না। চোখ না বুঝতেই ভেসে ওঠে কতগুলো শীর্ণ, বিশীর্ণ মুখ, মৃত্যুর শীতল স্পর্শ এসে পড়েছে তাদের চোখে মুখে। একটুকরো রুটি—এক মুঠো ভাত। বাড়ীতে গেলেই ঘিরে ধরবে ওরা ঃ বহুত ভুখ লাগি বাপজান। ছোটটা হয়ত কাছেও আসতে পারবে না। বোবার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকবে। সকালেই দেখেছে ইয়াসিন আর হাঁটার ক্ষমতা নেই। না খেয়ে খেয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে। শুয়ে থাকে চিৎ হয়ে আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে এদিক-ওদিক। কেমন একটা বোবা চাউনি—আগে কথা বলত আর এখন কথা বলতেও যেন ভুলে গেছে। হঠাৎ দেখলে চমকে ওঠে বুক, মনে হয় মরে গেছে বুঝি। শুধু মুমূর্ষু পশুর মত কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ করে।

ভারী বিশ্রী আর অস্বস্তিকর। এক ঘেয়ে মিইয়ে মিইয়ে কান্না। ইচ্ছে করে গলা টিপে শেষ করে দিতে কান্নার উৎসটাকে। কেমন একটা আনন্দ হয়। সমস্যার সমাধান যেন হয়ে গেছে। পেয়েছে সে উপায়। কেমন একটা লোভে নিস্‌পিস্ করতে থাকে সারা শরীর।

কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কেমন যেন বোবা হয়ে গেল সে। ছোটটা গড়িয়ে গড়িয়ে এসেছে জলের কাছে। উপুড় হয়ে কুকুরের মত কেমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে জল খাচ্ছে। জিভ দিয়ে চুক্ চুক করে চেটে চেটে। কেমন যেন বিশ্রী লাগছে দেখতে। চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। লাল হয়ে উঠেছে মুখটা। গলার শিরগুলো ফুলে উঠেছে পাম্প দেওয়া লম্বা বেলুনের মত। এই বুঝি দম আটকে মারা যায়। মরে ত যাবেই আজ নয় কাল। জল খেয়ে আর কদিন বাঁচবে? একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ইয়াসিন—যাকগে শালার বাচ্চা। আর বড়গুলোর একটার কেউ বাড়ী নেই। হয়ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, না হয় ভিক্ষে করছে, না হয়ত ভাঙ্গা গলায় প্রাণ খুলে খিস্তি করছে বড়লোকদের। ইয়াসিনের কাছেই শিখেছে ওরা। বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে ইয়াসিনের। হঠাৎ যেন কান্না পায়ঃ হায় আল্লা তৈরী ছুনিয়ামে এই সা বে ইন্‌সাফি। নাঃ আর সহ্য হয় না। আর পারছে না ইয়াসিন—আজ যেন জোর হারিয়ে ফেলেছে সে। বড় তুর্বল আর অসহায় বলে মনে হয় নিজেকে। যেমন করে হোক একটুকরো রুটি চাই। তার জন্য—বাচ্চাগুলোর জন্য। মনে ভেসে ওঠে কতগুলো মুখ, চেনা—ভারী চেনা। এপাশ ওপাশ ঘুরঘুর করে। কেমন একটা হাসি খেলে গেল ইয়াসিনের মুখে। উর্দ্ধশ্বাসে ছোটে ইয়াসিন। তুর্ব্বল শরীরে হাঁপ ধরে যায় মুহূর্তে।

মুখের থুথু শুকিয়ে আঠার মত হয়ে গেছে। গলার ভেতরটা জ্বালা করছে

কাগজে বণ্ড দিয়ে টাকা নেয় ইয়াসিন। আপাতত ধার হিসেবে নেয়। পরে অবশ্য কাজ করে মজুরী থেকে কিছু কিছু শোধ দেবে। টাকাটা হাতে নিয়ে ভাল করে চোখের সামনে তুলে ধরে। কেমন একটা মিষ্টি মধুর স্পর্শ। টাকা—আর ভয় নেই—এবার রুটি জুটবে; পেট না ভরুক, পেটে কিছু পড়বে। ছেলেগুলো বাঁচবে—রাস্তায় রাস্তায় ডাষ্টবিনের কাছে ঘুরঘুর করে আর বেড়াবে না। ছেলেটা আবার হাট্‌তে পারবে, উঠতে পারবে, কথা বলতে পারবে। নতুন নোটের কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ এসে লাগে নাকে। চোখে কেমন একটা স্বপ্ন জড়িয়ে আসে।

দোকান থেকে রুটি কিনে বাড়ী ফিরছিল ইয়াসিন হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মাঝপথে। অকারণে মনে পড়ল কতগুলো ক্ষুধার্ত মুখ। রমজান, রঘু, বনমালী, বেচু, বদন ও আকবরের শীর্ণ মুখচ্ছবি। অকারণে আবার মনে পড়ল কেষ্টর মুখটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরোর মত জ্বলজ্বলে। কঠিন ইস্পাতের মত ভাবলে শহীন একখানা মুখ: ছেলেটা মরে গেল ইয়াসিন ভাই—

থমকে দাঁড়াল ইয়াসিন: অসুখ বিসুখের খবর ত শুনিনি কিছু। হাসল কেষ্ট: অসুখ নয় ভাই না খেয়েই মারা গেল। ভালই হল, না খেয়ে আর কত দিন বাঁচত? আমারি ত চলতে ফিরতে হাঁপ ধরে যায় আর ওত কচি বাচ্চা কতদিন আর যুঝবে?

যেন বোবা হয়ে গেল ইয়াসিন।

কেষ্ট তেমনি বলল: শুনে আশ্চর্য হবে ভাই, মরবার আগে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কথা কইতে পেরেছে, ভাত চেয়েছে। বলেছে: এক গাল ভাত দে মা—একগাল ভাত। হাজার হোক ছোটলোকের ছেলে ত। হাসল কেষ্ট। দুপুরের রোদে ভারী আশ্চর্য সুন্দর

দেখাচ্ছিল কেষ্টর মুখখানা: আমরা কিন্তু হোটব না ইয়াসিন ভাই—কিছুতেই হোটব না। যেন কিছুই হয়নি। ভারী সহজ গলায় বলেঃ ছেলেটা মরে গেছে ইয়াসিন ভাই—ছেলেটা মরে গেছে। দিয়ে এলাম নিমতলায়। ভাবীকে পাঠিও না একবার। ছেলেটার মা ভারী কান্নাকাটি করছে কদিন ধরে। তার ওপর কিছু খাচ্ছেও না—ভারী মুশকিলে পড়েছে। তারপর হঠাং যেন হেসে ফেলল, বললঃ আর খাবেই বা কি বল? আর আছেই বা কি? খালি জল আর জল। কাঁহাতক আর মানুষে খেতে পারে? আচ্ছা চলি। যেও কিন্তু একদিন।

কেমন যেন করতে লাগল শরীরটা ইয়াসিনের। হাত যেন পুড়ে যাচ্ছে—রুটিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তার মাঝখানে। চোখের উপর ভেসে উঠল একটা ছবি। উপুড় হয়ে পড়ে কুকুরের মত চুক্ চুক্ করে জিভ দিয়ে টেনে টেনে জল খাচ্ছে একটা মাংসপিণ্ড।

উঁচু করে—মাথা উঁচু করে টান হয়ে দাঁড়াল ইয়াসিন। মুখটা কঠিন আর ভাবলেশহীন। চোখে আসন্ন লড়াই এর দৃঢ় অঙ্গীকার। হঠাং নিজের মনে হল সবার মাথা ছাড়িয়ে তার মাথাটা যেন আরো লম্বা হয়েছে।

ছাপ

দুপুর বেলাটা ঝিমিয়ে কাটায় আকবর আলী। বড় রাস্তাটার মোড়ে—যেখানে রিক্সাগুলো ভিড় করে গাদাগাদি হয়ে থাকে ভাড়ার আশায় সেখানে কিছুতেই গাড়ী বাঁধবে না আকবর আলী। রিক্সার ষ্ট্যাণ্ডটা পেরিয়ে বাঁহাতি গলিটার ভেতরে চায়ের দোকানটার গায়ে এসে গাড়ী বাঁধে।

ঘেমো গামছাটায় হাওয়া খেতে খেতে জিরোয় আকবর।

আর মদ খাওয়া রক্তাক্ত চোখে চেয়ে থাকে সামনেকার সাদা তেতলা বাড়ীটার সবচেয়ে ওপরের রাস্তার পাশের ঘরটার দিকে। জানালার পর্দাটা উড়লে হাওয়ায় ভেতরের কিছুটা চোখে পড়ে। একটা আলমারী আর চক্‌চকে আয়না—শোবার ঘরের খাটের কিছুটা —সাদা ধব্‌ধবে বিছানা। দেখতে দেখতে চোখ জড়িয়ে আসে আকবরের।

দূরে রাস্তায় হাইড্রেনে হোসপাইপ লাগিয়ে জল দিচ্ছে। কেমন একটা জলে ভেজা বাতাস এসে গায়ে লাগে। অসংখ্য জলবিন্দুর শীতল স্নেহস্পর্শ। কিন্তু দেরী করলে ত চলবে না—গদির তলা থেকে তেলের শিশি বার করে মাথায় মেখে নিল খানিকটা! রাস্তার কলে চট্‌ করে চানটা সেরে নিয়ে ছ'পয়সার টিনের ফ্রেমে বাঁধান আয়নায় ভাল করে মুখটা দেখে নিল। পট করে আঁচড়ে নিল মাথাটা। ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জিটা খুলে বার করল পরিষ্কার জামা! গামছাটা রেখে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দিল রঙ্গীন তোয়ালে। তারপর অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল একটা চিরপরিচিত শব্দের।

—এই রিক্সা ভাড়া যায়গা ?

—নেহি।

—কেও শোয়ারী হ্যায় ?

—নেহি।

ব্যাটা নবাব পুত্তুর টানিস ত রিক্সা—গরু ঘোড়া সামিল! এদিকে ত হয়ে আছে—আর মেজাজ দেখ না! ব্যাটাই বা কে? আর চিয়াং কাইসেকই বা কে? তেল মেখে তেড়ি কেটে—ওঃ আমার নবাব পুত্তুর। আপন মনে গজগজ করতে করতে চলে যায় লোকটা।

হাসে আকবর আলী। লাটসাহেব আসলেও ভাড়া যাবে না এখন। হাসানবানু কি করছে এখন? গম ঝাড়তে ঝাড়তে হাত বেচারীর ভারী হয়ে গেছে নিশ্চয়—কিন্তু উপায় নেই। কাজ না করলে খাবে কি। আকবর একটা মাস কিছুই পাঠাতে পারেনি। কি করে পাঠাবে ভেবেই পায় না! নিজেরই পেট ভরে না! শালা, আজব শহর কোলকাত্তা! এত টাকা—এত বাড়া—এত গাড়ী-ঘোড়া শুধু খাবারই অভাব। হাসানবানুর ছল্‌ছলে মুখটা চোখের সামনে বারবার ভেসে ওঠে আকবর আলার। সুর্মা পরা জলে-ভেজা চোখ।

—তুমকো জামা আচ্ছা নেহি—হিন্দু লোক বহুত বদমাস্ হ্যায় তুমকো কাট ডালে গা।

—তুম পাগল হ্যায়! কেতনা মুসলমান হ্যায় হামরা মাফিক।

—আউর রাজ হ্যায় হামলোককা। হেসে আকবর বলল: ডরনা মাত্। তুম কো প্যায়ারকা আদমি কো কই কুছ নেহি বোলেগা। হাসানবানুকে কাছে এনে আদর করে আকবর। আবেশে চোখের পাতা বুজে আসে বানুর। মরার মত আকবরের পেশল বুকের মধ্যে লেপ্‌টে থাকে। চোখ বুজে ভাবে আকবর। আবছা আবছা মুখখানা মনে পড়ে তার—চেষ্টা করে পুরোটা ভাবতে, কিন্তু কিছুতেই পুরোটা

আসে না—কোথায় যেন খুঁত থেকে যায়। আরো ডাকতে থাকে আকবর।

দূরে গাড়ীর আওয়াজ পোঁ—ওঁ—ওঁ।

তন্দ্রা ভেঙ্গে যায় আকবরের। ধড়মড় করে লাফিয়ে ওঠে।

কাদা ছিটিয়ে বাসটা এসে থামে সামনেকার তেতলা বাড়ীটার কাছে। বাইশ, তেইশ বছরের একটা মেয়ে নামে বই হাতে। সোজা উঠে যায় ওপরে সিঁড়ি দিয়ে।

হ্যাঁ করে তাকিয়ে থাকে আকবর তেতলার জানালার দিকে। একটা আয়নাওয়ালা আলমারী আর বিছানার কিছুটা অংশ চোখে পড়ে শুধু। তারপর শুভ্র কংকন পরা দুটো হাত পর্দাটা টেনে দেয়। সব ঢেকে যায়। শুধু হাওয়ার টানে মাঝে মাঝে পর্দাটা একটু ফাঁক হলে হাতের শুভ্র বরণ, শাড়ীর আঁচল আর কালো চুলের রাশ দেখা যায়।

কিছুক্ষণ পরে আবার পর্দা সরিয়ে অস্পষ্ট ভাসা ভাসা একটা মুখ এসে বসল জানলার কাছে। কি যেন চিন্তা করে আপন মনে। ভারী চেনা লাগে মুখটা, ভারী আপনার মনে হয়। মনে হয় ওই মুখের স্পর্শটা পর্যন্ত মুখস্ত তার। সে মুখটা কার? সুদূর দ্বারভাঙ্গার এক নিভৃত পল্লীতে সে মুখটি হয়ত প্রাণান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। কারো বাড়ী হয়ত জনমজুরী নিয়েছে। তা না হলে হয়ত গম ভাঙ্গছে সারাদিন। আজ এখানে যদি হাসানবানু থাকত রোজ গাড়ী চড়াত তাকে একবার। বড় ময়দানে হাওয়া খিলাতে নিয়ে যেত। নিয়ে আসবে তাকে—ভাবতে পারে না কি করছে এখন হাসানবানু।

পুরুষ কণ্ঠের ডাক আসে: এই ভাড়া যাবি?

—চলিয়ে, কাঁহা পর?

—শিয়ালদা, কত নিবি?

—সে আপনি ভদ্দর লোক আছেন যা দিবেন—লিন উঠেন।

উঠে দাঁড়াল আকবর। তারপর তেজি ঘোড়ার মত ঘাড় টান করে ছুটে চলল। হাতের ঘণ্টা বেজে চলে অবিরাম।

—এই শালা শুয়ার কি বাচ্চা, আন্ধা হোকে—

প্রাণপণে রিক্সাটা থামাতে চেষ্টা করে আকবর। সামনে একটা গাড়ী, বরাত জোরেই হোক আর ড্রাইভারের কৃতিত্বেই হোক কাটিয়ে নিল গাড়ীটা।

গালাগালি দিতে দিতে গাড়ীটা চলে গেল।

ভারী বিশ্রী লাগে আকবরের—বিশ্রী এই মোটর গাড়ীগুলো। হায় আল্লা—কেন এসব তুমি বানালে? আমরা সারাদিন মুখের রক্ত তুলে খাটি, তবুও না খেয়ে থাকি। আর, মটর গাড়ী দু'চার ঘণ্টা যারা চালায় তারা কত টাকাই না রোজগার করে। তোমার রাজত্বে এই অনিয়ম—এ অন্যায় তুমি বন্ধ কর। আচ্ছা একদিন সমস্ত গাড়ীগুলো খারাপ হয়ে যেতে পারে ত? কেন পারে না? খোদার শক্তি হলেই হয়। একদিন তাই করে দিও খোদা—মোনাজাৎ মাগে দরগায়। মসজিদে সিন্নি দেবে আকবর। অন্তত একদিনের জন্যও গাড়ীগুলো বন্ধ হয়ে যাক!

সবগুলো না হোক একটা অন্তত। একটা গাড়ী যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে একদিন অন্তঃ গাড়ী চড়াতে পারবে আকবর। পিয়ারা শাজাদী এসে বসবে রিক্সায়। বলবে: আমায় নিয়ে চল ওগো বন্ধু। আকবর নিয়ে যাবে তাকে অনেক দূরে: আরেক রাজ্যে। সেখানে বাসা বাঁধবে দু'জনে। মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার নমস্কার দেয় মনে মনে: হিন্দুদের খোদা ভগবান—একবার মুখ তুলে চাও।

প্রথমে বুঝতে পারে না আকবর। চোখটায় একবার হাত বুলিয়ে নিল সে। সত্যিই যেন কে একজন ডাকল তেতলা বাড়ী থেকে। রিক্সা নিয়ে এগিয়ে গেল আকবর।

—কলেজ ষ্ট্রীট ভাড়া যাবি ?

—কেন যাব না বাবু—কজন শোয়ারী ?

—কজন আবার একজন—কত নিবি ?

চোখ বুজে ভাবে আকবর হাসানবান্নুকে গাড়ী চড়াতে পারছে না। আহা বেচারী ! যদি আজ এখানে থাকত—মুখটা ভাবতে চেষ্টা করে : সেই চোখ, সেই নাক, ঘন-পল্লবিত কালো চোখ। আকবরের হাসানবান্নু সুদূর দ্বারভাঙ্গায় গম ভাঙ্গছে। শহর দেখল না—শহরে থাকলে লেখাপড়া শিখতে পারত। দারুণ বুদ্ধিমতী। হাসানবান্নু। আকবর হাসানবান্নুকে গাড়ী চড়াবে। আর হাসানবান্নু অন্যের গাড়ীতে চড়বে এ কেমন করে হয়।

—যা দেবেন বাবু—বাজার দেখে।

—কত নিবি বল—ঝঞ্ঝাটের দরকার নেই।

—ছ আনা দেবেন।

অবাক হয় লোকটা : কত ছ আনা ! অ্যাঁ ?

তার হাসানবান্নু যাবে গাড়ীতে, আর সে কিনা পয়সার জন্য দরাদরি করছে।

—আচ্ছা পাঁচ আনাই দিবেন।

গোলগোল চোখে চেয়ে থাকে—কি বলবে ভেবে পায় না। গদিটা ঝাড়তে থাকে আকবর। তার ওপর সযত্নে পেতে দেয় নাম লেখা তার সাধের তোয়ালে।

একটা লোক এসে দাঁড়ায়। জুতোর আওয়াজ কানে আসে তার। শুনেও শোনে না—ভাল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঝেড়ে মুছে দেয় রিক্সার এদিক ওদিক। পিয়ারী শাজাদী এসে বসবে।

—এই সরে দাঁড়ানা ব্যাটা !

চমকে ওঠে আকবর। মুহূর্তে সরে দাঁড়ায়। লোকটা উঠে বসে গাড়ীতে। ওজনের ভারে বেঁকে যায় গাড়ীটা।

—চল কলেজ ষ্ট্রীট। অত জোরে নয়রে, আস্তে। আমার আবার বুকের ব্যারাম আছে বুঝলি!

কান্না পায় আকবরের—তার শাজাদীর জায়গা শয়তানে কেড়ে নিল।

তবুও দুপুরের শেষ দিকে কোথাও ভাড়া যায় না আকবর। নিঃশব্দে বসে থাকে। প্রত্যেক দিনের পুনরাবৃত্তি ঘটে রোজ। তেমনি ফুলেল তেলে মাথায় পাট করে জামা পাল্‌টায়। আর তেমনি গাড়ী আসে—হাসানবান্নুর মুখ এসে দাঁড়ায় জানলায়।

নিঃশব্দে ভাড়া নিয়ে চলে যায় আকবর। অন্যান্য রিক্সাওয়ালারা ফোড়ন কাটে: শাহান শা যাচ্ছে।

ভালো লাগে না এই সহর। বিশ্রী এই বাংলা মুলুক। দেশে চলে যাবে আকবর। বোরখা ঢাকা কালো সুর্মাটানা মেয়েটাই মনের সবখানি তার ঢেকে রেখেছে। দেশে জন-মজুর না হয় খাটবে—তাও ভাল। দরকার নেই আর হাসানবান্নুকে গাড়ী চড়িয়ে!

তবুও একদিন অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে গেল আকবরের জীবনে। রোজকার মত আজও এসে বসেছে। দু'আনার ছাতু, লংকা আচার দিয়ে খেয়ে আয়েস করছে। দেশে হাসানবান্নুর ছাতু আরো কত মিঠে—কত ভাল। অনেক দিন বাদে আকবর যেন দেশে ফিরে গেছে। হাসানবান্নু কেঁদেই অস্থির। আকবরকে জড়িয়ে ধরে বলছে: কাজ নেই তোমার সে বাংলা মুলুকে গিয়ে—খাই না খাই এবার এখানেই থাকতে হবে। আমার কত কষ্ট—কি করে একলা থাকি বল ত?

আকবর যেন বলছে: চল এবার তুমিও আমার সঙ্গে। আমি গাড়ী চালাই—রোজ তোমাকে চড়াব—বড়া ময়দানে হওয়া খিলাতে নিয়ে যাব!

—সত্যি? আরো ঘেঁষে আসে হাসানবান্নু।

আকবর বলে ঃ পিয়ারী শাজাদা আমায় পথে ডেকে বলবে : এই রিক্সাওয়ালা শুনো—

—এই ভাড়া যায় গা ?

ঘুমের ঘোরে আকবর বলে ঃ নেহি। তারপর হঠাৎ কি মনে হতে চোখ চেয়ে দেখে হাসানবানু এসে দাঁড়িয়েছে তার গাড়ীর সামনে। এরই স্বপ্ন দেখছিল সেই সুদূর দ্বারভাঙ্গায়—তার হাসান বানু—তার দিলকা পিয়ারী!

—কাঁহা পর যানে হোগা বাতলাইয়ে ?

—ট্রাম রাস্তায় চল! কত নিবি ?

বিনা পায়সায় সে হাসানবানুকে গাড়ী চড়বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

—যা দিবেন। বলে গদিটা ভাল করে ঝেড়ে দেয়। গদির তলা থেকে তার পরিষ্কার তোয়ালেখানা পাতে বসবার গদিটার ওপর।

সে উঠতে গিয়ে বলে ঃ এই গামছা হটাও। তারপর সরাবার অপেক্ষা না করে নিজের পাদানির ওপর ফেলে দিয়ে বলল, উঠাও।

পাদানি থেকে নিঃশব্দে তোয়ালেটা কাঁধে তুলে নিল আকবর। হাতের ঘণ্টা হাতলে ঠুকে টানতে শুরু করে দিল।

কিন্তু হাসানবাবু ? স্মৃতির জঞ্জাল সরিয়ে খুঁজে ফেরে সে সুদূর দ্বারভাঙ্গা নিভৃত পল্লীর সেই অবজ্ঞাত তরুণীর মুখ, সেই চোখ, সেই নাক, সেই—

—জলদি চলো।—হমকে দের হোতা হ্যায়—

চাবুক খাওয়ায় মত পেছন ফিরে তাকাল আকবর। নজরে পড়ল নাকের পাশে জ্বলন্ত রক্ততিলটা। হ্যাঁ সেই হাসানবানু! তার দিলকা পিয়ারী—রূপকথার শাজাদী। বোবা পশুর মত হাতলের ওপর ঝুকে পড়ল আকবর আলী। পেছনে ফিরেও দেখতে পায়নি কাঁধের ওপর ঝোলান তোয়ালের ওপর ময়লার দাগ লেগেছে। হয়ত লেডিজ জুতোর ছাপও হতে পারে।

মই এর ভারে কাঁধটা টন্‌টন্ করে ওঠে কানাইর। আজকাল আর আগের মত জোর পায় না যেন! সকাল সন্ধ্যায় তার খাটনি ত আর কম নয়। দেব লেন, ডিহি ইণ্টালী রোড আর ফুলবাগান রোডের গ্যাসগুলো জ্বালতে হয় তাকে। গ্যাস বাতিগুলো গুনতিতে ও আর নেহাৎ কম নয়। একশ দেড়শ হবে নির্ঘাৎ। অবশ্য গুনে দেখিনি কোনদিন। ছুটোছুটি করতে দম বেরিয়ে আসার মত হয়।

গলির মোড়ের সর্বশেষ গ্যাসলাইট জ্বালিয়ে হাঁপ ধরে যায় কানাইর। শরীরটা যেন আগের মত নেই। আগের চেয়ে যেন জোরও অনেক কমে গেছে। মইটা ফুটপাতের ওপর ফেলে অনেকক্ষণ ধরে জিরোয় কানাই। সামনের টিউবওয়েল থেকে এক পেট জল খেয়ে একটা বিড়ি ধরালো।

খালি পেটে জল খাওয়াতে পেট মোচড়াতে থাকে ভীষণ। গা বমি বমিও করে। দূর শালা—বিড়িটাতে একটা জোর সুখটান দিয়ে ছুঁড়ে দেয় সামনের দিকে।

ফতুয়ার পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে আবছা গ্যাসের আলোয় পড়তে থাকে। এর আগেও প্রায় সাত আটবার পড়েছে, তবুও আর একবার পড়ে। মা লিখেছে, সংসারের অবস্থা বড় টানাটানি যাচ্ছে। কমাস কানাই কিছু পাঠায়নি একেবারে—কি করে চলে সংসার? আগের মত আর চাষ আবাদ হচ্ছে না, আর বছর চলার মত জমি জমা কই তাদের? আইবুড়ো বোনটা দিন দিন কেমন ফুলে ফেঁপে বড় হচ্ছে। পরনে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই—এসময় বিয়ের চেষ্টা করতে হয়—

চিঠি পড়তে পড়তে চোখ তুলে চায় কানাই। এসময় বিয়ে দেওয়া উচিত নয়ত—পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরালো। এইত সেদিন অত বড় ঘরের মেয়েটা বেরিয়ে গেল একটা লোকের সঙ্গে। নষ্ট হয়ে গেল মেয়েটা। আহা! বিড়িতে জোর টান দেয় কানাই। কানাই-দের বস্তির সামনেকার যে মস্ত তিনতলা বাড়ী—সেই বাড়ীতে থাকত মেয়েটা। ভারী সুন্দর শান্ত সে। রোজ সকালবেলা গাড়ী করে পড়তে যেত মেয়েটি একগাদা বই নিয়ে স্কুলে না কলেজে কোথায় যেন। সেই মেয়েটাই কিনা একটা লোকের সঙ্গে বেরিয়ে গেল? ছ্যা ছ্যা পড়ে গেল। থানা পুলিশ কত কি করে কোন ষ্টেসন থেকে ধরে নিয়ে এল দুজনকে। কাগজেও ছবি উঠেছিল দুজনের। মেয়েটা কপালেও নাকি সিঁদুর দিয়েছিল। পুলিশকে বলেছিল: ও আমার স্বামী। ছ্যা ছ্যা। না; একটা ব্যবস্থা করতেই হবে বোনটার। কবে কি করে বসবে কে জানে? বিশ্বাস নেই।

আবার চিঠিটা দেখে কানাই। কাপড় নেই—পাঠাতে হবে। দুর ছাই। খালি নেই আর নেই আর চাই আর চাই। চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে রেখে দেয় ফতুয়ার পকেটে। বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় কানাই। পয়সায় তিনটে বিড়ি। শালা যেন মগের মল্লুক পেয়ে গেছে। পঁয়-তাল্লিশ টাকা মাইনে আর বিড়ি খেতে হয় দিনে দু'আনার। ঝাড়ু মার অমন নেশার মুখে।

মইটা কাঁধে তুলে উঠে দাঁড়ায় কানাই। পা দুটো অবশ হয়ে আসে তার। ভয় হয় হয়ত বাড়ী গিয়ে পৌছুতে পারবে না।

জলে ভিজে মইটার ওজন বেড়েছে অনেক। আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে পা চালায়। বাড়ী ঠিক বলা যায় না—বাঁশের ওপর মাটি ধরানো বেড়া; মাথার ওপর খোলার চাল। মাথা গুজবার মত আস্তানা বটে! একটু জোরে বাতাস পেলে তাসের ঘরের মত কাঁপে আর জল হলে কথাই নেই। চাল দিয়ে জল ঝরে—বিছানা

বালিস সরিয়েও নিস্তার নেই, জলে ভিজে সব ঢোল হয়ে যায়। বনমালীটা বেশ বলে ঃ তোর ত বাড়ী নয় কানাই শালা খাটাল। একটু বোসবার উপায় নেই জল কাদা প্যাচ প্যাচ করছে মেঝেটা—কি করে যে থাকিস এর মধ্যে ?

—কি করব বল থাকি কোন রকমে। উপায় কি—সাড়ে নটাকাতে কি আর কোঠাবাড়ী মিলবে ?

ভুঁচোখ ছানাবড়া করে বনমালী বলে ঃ বলিস কি সাড়ে নটাকা ভাড়া দিস ? গুল মাবার আর জায়গা পেলিনি মাইরি।

কানাই বলে ঃ বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি—তা হবে কেন আর থাকিস ত কোম্পানীর গুদামে বুঝবি কোত্থেকে শুনি। একদিন লাথি মেরে হটিয়ে দিলেই বুঝবি সাড়ে নটাকা লাগে না কত লাগে।

—ভাড়া দিস মাস মাস তবে ঘরে জল পড়ে কেন শুনি ? বলতে পারিস না বাড়ীওয়ালাকে, মুখে কি ছিপি এঁটে থাকিস, অ্যা ?

—বলে বলে মুখ পচে গেছে। খালি বলে : ভারা টানাটানি যাচ্ছে। এই মাসে মেয়ের বিয়েতে কুড়ি হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। তোরা ত দেখেছিস কেমন খাওয়া দাওয়া হয়েছিল তিন দিন ধরে। কটা মাস বইত নয় কোন রকমে কাটিয়ে দেনা বাবা—সামনের বর্ষায় দেব সব পালটে, কোন কথা বলতে হবে না আর—

—ওঃ, ভারী পিরীতের কথা শোনাল আর তুই গলে গেলি ? অতবড় লোক তোকে বাবা বলেছে আর তুই গলে গেলি। কিন্তু আমি হলে—ষ্টিলের ফ্রেমের মত শক্ত হয়ে আসে বনমালীর মুখ।

কেমন বোকা বোকা চোখে তাকায় কানাই। বলে : তুই হলে কি করতিস, অ্যাঁ ?

—দিতুম হারামীর বাচ্চার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে। তোর সাথে কথা কইতেও ঘেন্না করে। পিচ করে খানিকটা থতু ফেলে পা দিয়ে ঘসে মাটির ওপর লেপটে দেয়। পরে বলে : দিবি শালার বস্তিতে

একদিন আগুন দিয়ে। যদি না দিস ত আমার দিব্যি রইল। পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে বড় বড় পা ফেলে চলে যায় বনমালী।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কানাই। মাঝে মাঝে কেমন হয়ে যায় বনমালীটা। মাথায় বোধহয় ছিট্ আছে।

বাড়ী ফিরে মইটা খাড়া করে রাখে ঘরের চালের সঙ্গে। কেমন যেন শীত শীত করে। জ্বর এলো বোধহয়। কদিন ধরে কি যে হচ্ছে —সন্ধের দিকে রোজই জ্বর আসে। বেশ কাঁপিয়ে জ্বর আসে। বুক ব্যথা। মনে হয় কতগুলো পোকা যেন কুরে কুরে খাচ্ছে বুকটা। মোটা কাঁথাটা জড়িয়ে কোন রকমে পড়ে থাকে বিছানায়। মাথার কাছে কেরোসিন তেলের কুপিটা জ্বলে। বাতাসে কাঁপে শিখা। ভারী বিদঘুটে গন্ধ বেরোয়। মাথাটা ঝিম্ ঝিম করে ওঠে।

পাশের ঘরে কালো মেয়েটা গান গাইছে বোধ হয়। রিড ভাঙ্গা হারমোনিয়াম আর গলা বাজছে বিভিন্ন পর্দায়। ভারী হাসি পায় কানাইর। কে নাকি ওকে আশ্বাস দিয়েছে গান শিখলেই সিনেমায় নামিয়ে দেবে। তাই দিন নেই রাত নেই গান। ভারী দুঃখ হয় কানাইর। এত বোকাও মানুষ আছে। কোনদিন কি আয়নায় মুখ দেখেনি? কালীতারা না কি নাম ছিল আগে। সেদিন সিনেমা দেখে নাম পালটে রেখেছে কাজল। দুচার দিন আগে একগ্লাস জল চেয়েছিল কানাই: এই কালী জল দে দেকিনি একগ্লাস।

প্রথমে ঝাঝিয়ে উঠেছিল কালী: কিগো কানাইদা কালী কার নাম? একদিন না তোমাকে বলেছি আমার নাম কাজলি। কিন্তু রোজ রোজ ভুলে যাও কেন বুঝিনা!

থ হয়ে গেল কানাই। বলে কি মেয়েটা। জল গলায় আটকাবার জো হয়েছিল।

জল দিতে দিতে বলেছিল ঃ কেমন দেখতে হয়েছে বল দেখি আমায়। সিনেমায় নামতে পারব ত? তুমি রাস্তায় ঘোর এত বনশ্রী দেবীকে দেখেছ কোনদিন? আমার চেয়েও কি সে দেখতে সুন্দর?

বিষম খেয়েছিল কানাই। সিনেমা সিনেমা করে পাগল হয়েছে মেয়েটা।

কাল দুপুর বেলা ঘরেই ছিল কানাই। কেমন তন্দ্রার মত এসেছিল। খালি ঘরবার করছিলে মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ ঘরের মাঝে এসে ডাকল ঃ কানাইদা—ঘুমোচ্ছ নাকি?

ঘুমের ঘোরে কানাই উত্তর দিল ঃ হুঁ।

—কি যে ঘুমোও দুপুরবেলা। কাজকর্ম নেই বুঝি। ওঠ ওঠ। ধড়মড় করে উঠে বসল কানাই ঃ কেন, কি হয়েছে?

—কিছু না। একটা গান শুনবে?

কানাই অবাক! গান এই দুপুর বেলা? কানাই বলল ঃ তোর মাথা খারাপ হল নাকি? এই কাঠফাটা রোদ্দুরে গান—

—সকাল বেলায় তোমার ফুরসৎ হয় না। কোম্পানীর কাজে টোটো করে বেড়াতে হয়। আমি যে কষ্ট করে গান শিখছি, কই তুমি ত বললে না কেমন হচ্ছে। একবার শোনই না।

—না না, শুনেছি বই কি। রোজই শুনি। বেশ হয়েছে। আর কটা দিন পরেই হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

—সত্যি? না, তুমি মন রাখা কথা কইছ। হারমোনিয়াম নিয়ে আসি। চোখে চোখে রাখি হায়রে—গানটা তুলেছি।

—থাক থাক কষ্ট করে এখন হারমোনিয়াম আনতে হবে না। সন্ধে বেলায় না হয় শুনব। তখনই না হয়—

খানিকক্ষণ কি ভেবে কালী বলল ঃ বেশ তাই হবে। দুএক জায়গায় ঠিক ঠিক ওঠেনি এখনও। আচ্ছা দশ আনা পয়সা ধার দেবে কানাই

দা? দু'দিন পরেই দিয়ে দেব। এখন বন্দীটা একবার দেখলেই গানটা তুলতে পারব—দেবে?

—পয়সা কোথায় পাব কালী। কটা টাকাই বা পাই, খেতেই পাই না—

—জানি গো জানি আমি সিনেমায় প্লে করি কারো ইচ্ছে নয়। সব হিংসায় মরছ, না হলে—আচ্ছা একবার নামি তখন যেও দারোয়ান দিয়ে দেব দূর দূর করে তাড়িয়ে। না দিই ত আমি কালীই নই। দুম্ দুম্ করে পা ফেলে চলে গেল সে। রাগের মাথায় কাজলি পর্যন্ত বলতে ভুলে গেছে।

সত্যি পঁয়তাল্লিস টাকা মাইনেতে আর সিনেমা দেখে না। মা, বোন যার ন্যংটো হয়ে থাকে তার আবার বিলাসিতা। আগে তবুও দুপুর বেলাটা ঠিকে কাজ করত দু একটা। জলের পাইপের কাজে ভারী ঝোঁক ছিল এককালে। অনেক ঘুরে অনেক তেলিয়ে শিখেছিলো কিছুটা। তাতে আসত দু' চার টাকা। তাও আবার বাবুদের সইল না। নোটিশ দিয়েছে: কোম্পানীর কাজ ছাড়া বাইরে কেউ ঠিকে কাজ আর করতে পারবে না। কয়েকদিন আগে আপিসে তলব পড়েছিল কানাইর। কে জানে কোন শালা বড় সাহেবের কাছে চুকলি খেয়েছিল। ভারী তাড়া দিয়েছিল সাহেব ব্যাটা। ভয়ে ভয়ে ঠিকে কাজ ছেড়ে দিল কানাই।

রোববারে একটা ঠিকে কাজ নিয়েছিল বনমালী। সকাল বেলা তাই এসে হাজির।

আলো নিবিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে কানাই সবে—দেখে ঘরে বসে বনমালী দিব্যি চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে।

কিরে, কি ব্যাপার। সকালেই যে এসে হাজির?

—ঠিকে কাজ হাতে পেয়েছি একটা। চুক্তির কাজ দশ বার টাকা পাওয়া যাবে।

বড় সাহেবের মুখটা চোখের উপর ভেসে ওঠে কানাইর। শালা যেন দাঁত খিচোচ্ছে।

—পাঁচ, ছ' টাকা পাওয়া যাবে ভাগাভাগি করে।

কোন শালা যদি আবার চুকলি খায় ভাবে কানাই। মুখে বলে: শরীরে তেমন জুত পাচ্ছিনা ভাই মানে—

—কেন? শরীরের আবার কি হল। নে নে ও কিছুই না। চা খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবি এখন।

—না ভাই—আমতা আমতা করে কানাই।

এবার বনমালী তাকায় কানাইর দিকে। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে যায় কানাইর। ফ্যাকশে হয়ে আসে মুখটা।

বনমালী বলে: মিথ্যে কথা বলছিস কানাই। বলত ব্যাপার কি অ্যাঁ?

আমতা আমতা করে বলে কানাই: কে জানে কোন এক শালা বড় সাহেবের কাছে আমার নামে চুকলি খেয়েছে। ভারী খিস্তি করল সাহেব। বললে ফের যদি শুনি ছাড়িয়ে দেব চাকরী থেকে।

—তুই কি বললি? বনমালী জিজ্ঞেস করল।

—আমি আর কি বলব। বললাম, না স্যার, সব মিথ্যে কথা। মিছিমিছি চুকলি খেয়েছে আপনার কাছে।

—দূর শালা কুত্তা; মাগীর অধম। ঝাঝিয়ে উঠল বনমালী। বনমালীর চোয়ালটা আবার যেন ষ্টীলের ফ্রেমের মত শক্ত হয়ে আসছে: বলতে পারলি না কেন ঠিকে কাজ নাহলে পোষায় না। সংসার চলে না—মা, বোন না খেয়ে থাকে—পরনে ন্যাকড়া জোটে না, পঁয়তাল্লিস টাকায় মানুষ বাঁচতে পারে না—থু থু, করে থুতু ফেলে বনমালী যন্তরের থলেটা কাঁধে করে একাই বেরিয়ে যায়।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কানাই। সকালটা কেমন যেন ম্লান হয়ে যায়। ঠিকে কাজ করে না বলে কোথায় অন্যায় করেছে

কিছুতেই ভেবে পেল না সে। যারা প্রাচুর্যের মধ্যে বসে আছে, দারিদ্রের ক্ষুধা কি জানে না, তাদের কাছেই সত্যির মূল্য আছে— তারাই স্বর্গ ভোগ করার দাবী করতে পারে। করুক তারা কিন্তু আমরা সকলের মত পেট ভরে খেতে চাই—লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড় চাই। এর জন্য দরকার হলে আমরা মিথ্যে কথা বলব একশবার, মিথ্যে কথা বলব। পঁয়তাল্লিশ টাকায় যে আমাদের চলে না—কেমন যেন কান্না পেতে থাকে কানাইর।

চায়ের জল উথলে পড়ে উনুনটা নিবু নিবু হয়েছে। সিল-ভারের বাটিটা নামিয়ে রাখল. কি ভাবে চা আর খেল না কানাই। বুকটা কেমন যেন ধড়ফড় করছে। আবছা দেখছে চোখে। সেই-খানে আস্তে আস্তে বসে পড়ল সে। চোখ চাইতেই দেখল ওপাশের ঘরের সুন্দর বৌটা চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। উঠে বসল কানাই।

বৌটা বলে : অমন করছিলেন কেন ফিটের ব্যামো আছে নাকি ?

—না ত ; আমি অজ্ঞান হয়ে গেছলাম নাকি ?

—হ্যাঁ, এ পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম ঘরের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন। জলের ছিট দিতেই জ্ঞান হল। চা খাবেন ? আমার হাতে চা খাবেন ত ?

ক্লান্তস্বরে কানাই বলল : দাও—

কিছুক্ষণ পরে এককাপ চা দিয়ে গেল কানাইকে। আশ্চর্য ! বাইরে থেকে মানুষ চেনা কি কষ্টসাধ্য।

বড় গাড়ী আর গাড়ীর মালিককে বেড়াতে নিয়ে এসেছে বৌটার স্বামী। পঞ্চাশ টাকার কেরাণী বিলাসিতা দেখলে মনে হয় রাজা-মহারাজা। ঘেন্নায় কথা কয়নি কোনদিন কানাই ওদের সঙ্গে। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মুখোমুখি হলে। গরীব বলে চরিত্র খারাপ করতে হবে নাকি ? ইচ্ছে করে—ওরকম লোকদের চাবুক মারতে

ইচ্ছে করে কানাইর। কথায় কথায় বলে: আমার বন্ধু সেই যে পরশুদিন রাতে এল সে লক্ষপতি, কথায় কথায় হাজার টাকা দিতে পারে। করবেন নাকি চাকরি? চলুন একদিন কানাইবাবু বললেই ভাল চাকরি হয়ে যাবে। কি যে চাকরী করেন—পকেট থেকে 'ক্যাপ্সটেন' টিন বার করে বলল: চলবে নাকি ভাল সিগারেট। ছ আনা প্যাকেট—আমার আবার ভাল সিগারেট ছাড়া মুখে রোচে না—

—না সিগারেট আমি খাই না। পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে পাই বিড়ির পয়সাই জোটেনা—

—পয়সা কি আর ঘরে শুয়ে থাকলে আসে—খাটাতে হয়—মাথা খাটাতে হয় বুঝলেন। মাথায় হাত দিয়ে দেখাল সে। আমি ত পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাই কিন্তু আমার সিগারেট খরচাই মাসে পঞ্চাশ টাকা। লোকটা হাসে। সামনের সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁতগুলো ঝিক মিক্ করে।

কেমন অস্বস্তি বোধ করে কানাই। বলে: সকলের মাথা কি আর সমান হয়।

দুপুর বেলা কালী আসে। বলে: 'চান্স' একটা শিগগির পাবে কানাইদা। মালতী বৌদির ঘরে পরশু যে বাবুটি এসেছিল সে নাকি ভারী ভাল লোক। আজকে এলে মালতী বৌদি বলবে আমার কথা। আচ্ছা প্রথম বইতে কত টাকা পাওয়া যাবে বলত? দশ হাজার? আট হাজার ত নিশ্চয় কি বল? একলাখ হলে একটা গাড়ী আর বাড়ী করতে হবে বালীগঞ্জে। তখন চিনতেই পারবনা তোমাকে কানাইদা।

—বেশ সুখের কথা, বলল কানাই।

—তুমি রাগ করলে কানাইদা? তোমাকে ভুলতে পারব না সত্যি বলছি। তোমাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না। আচ্ছা

তোমার কোন বড় লোক বন্ধু নেই মালতী বৌদির স্বামীর মত। একদিন নিয়ে এসো না যে ক্লিম তোলে।

—আর জ্বালিও না কালী আমার শরীর ভাল না।

ঝাঁঝিয়ে ওঠে কালী: কালী কার নাম গো? আমার নাম ত কাজলি। কাজলি বলতে কি তেমার জিভ ব্যথা করে নাকি?

আশ্চর্য কেমন যেন এরা! কাজলি, মালতী বৌদি, তার স্বামী আর বনমালী সত্যি এরা যেন সবাই কেমন।

এদের এত কাছে থেকেও এদের মনের ছোঁয়া আজও পেলো না কানাই।

সন্ধে হতেই কানাই কাঁধে মই নিয়ে ছোটে। গলির মোড থেকে লাইনগুলো জ্বালাতে যায়। হঠাৎ মাথাটা কেমন করে ওঠে। কিছু বোঝার আগেই মই নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রাস্তার ওপর মূহূর্তে লোকে লোকারণ্য। এ্যাম্বুলেন্স আসার আগেই মরে কাঠ হয়ে যায় কানাই। শুধু মুখের কস বেয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে রাস্তার ধূলোকণার ওপর জমে থাকে। একটা ঘেও কুকুর কোথা থেকে এসে চাটতে থাকে সেই রক্ত।

বাইরের আলো জ্বালতে জ্বালতে কবে তার ভেতরের আলো নিভে গেছল তার খবর পায়নি কানাই।